বিচিত্র একাঙ্ক

॥ নাট্যগুচ্ছ ॥

মন্মথ রায়

সাহিত্য সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক
সমবায় সমিতি লিমিটেড
৫০, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মন্মথ রায়ের

বিচিত্র একাঙ্ক

॥ নাট্যগুচ্ছ ॥

প্রকাশক : সমীর সেনগুপ্ত
সাহিত্য সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক
সমবায় সমিতি লিমিটেড্
৫০, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জুলাই : ১৯৬১

প্রচ্ছদ শিল্পী : বিরাজ সেনগুপ্ত

মুদ্রণ : অবনীকান্ত দাস
বিবেকানন্দ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড্
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

মূল্য তিনটাকা

নাট্যকার মন্মথ রায়ের ঠিকানা :
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা-৬
টেলিফোন : 35-3125

বিচিত্র একাঙ্ক

আটত্রিশ বছর আগে আমার দেড় ঘণ্টার একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' বড় বেশী ছোট বলে একক চলে নি। তখন ছিল পাঁচ ঘণ্টার নাটকের রেওয়াজ।

যুগের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনের কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেল, অবসর গেল ক'মে। নাটকের দৈর্ঘ নেমে এল আড়াই ঘণ্টায়। আড়াই ঘণ্টা থেকে নামলো এক ঘণ্টার একাঙ্ক নাটকে। আজ এই 'স্পুটনিক'-যুগের গোড়াতে আধঘণ্টার একাঙ্ক নাটকও চল্‌ছে। এমন দিন ও আসছে যখন দশ পনর মিনিটের নাটকেরও হবে চাহিদা। সেদিন আসছে মনে করে পাঁচ সাত দশ মিনিটের কিছু একাঙ্ক নাটকও রেখে গেলাম আমি। এই সংকলনেও।

আজকের একাঙ্ক নাটকই ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ নাটক। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সে যুগ আসন্ন। নাটকের মান তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না, বরং বাড়বে। 'এটম্'-বিন্দু শক্তির সিন্ধু।

মন্মথ রায়

১লা আষাঢ়
১৩৬৮, বঙ্গাব্দ

বিচিত্র একাঙ্ক

শ্রীমতী কুমকুম দাশগুপ্তা
শ্রীমান বিশ্বরঞ্জন দাশগুপ্তকে
স্নেহাশীষ
আশীর্বাদক
মন্মথ রায়
১লা আষাঢ়
বঙ্গাব্দ ১৩৬৮

বিচিত্র একাঙ্ক

॥ নাট্যগুচ্ছ ॥

সূচিপত্র

জন্মদিন

—আজ তোমার জন্মদিন।

—ও, তুমি এসে গেছ ?

—প্রত্যেক জন্মদিনেই আসি।

—ভাগ্যিস তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। শুনতে পায় না কেউ তোমার কথা। তাই রক্ষে। নইলে জন্মদিনে মৃত্যুর দেবতা তুমি আমার পাশে বসে আছ। সবাই আঁতকে উঠত।

—এ দিনটীতে তোমাকে যারা ভালবাসে, তারাই আসে তোমার কাছে। আমিও তাই এসেছি। তারা তোমাকে চায়। আমিও তোমাকে চাই।

—হ্যাঁ, ঠিক। তারা আমাকে চায়। তারা আমাকে দিতে চায়। তুমি আমাকে চাও। তুমি আমাকে নিতে চাও।

—বটেই তো। তাদের দেওয়া যখন ফুরবে, তখনই আমি তোমাকে নেব। জান তো, নিঃস্ব আর কাঙালের উপরেই আমার লোভ। হ্যাঁ, একজনের যখন কিছুই থাকে না, কিছুই রইল না, তখনই আমি তাকে বুকে টেনে নিতে পারি। তার আগে নয়। তাই প্রতি জন্মদিনে আমি ছুটে আসি দেখতে, তোমার এখনও কি আছে।

—কিন্তু এখনও তো আমার সবই আছে।

—হ্যাঁ আছে। স্ত্রী আছে। পুত্র কন্যা আছে। বন্ধু আছে। প্রচুর আত্মীয়স্বজন রয়েছে। কিন্তু তাদের নিয়ে গর্ব করবার মত এখনও তোমার কিছু আছে কি? তা যদি না থাকে তবে তো তারা থেকেও নেই।

—চুপ। আমার স্ত্রী আসছেন।···এস গো। দেরি কেন?

—স্নান সেরে পূজো করে এলাম। কই,পা দুখানি কই? প্রণাম করি।

—এতকাল ঘুম থেকে উঠেই এই দিনটিতে সবার আগে আমাকেই করতে প্রণাম।

—এতকাল তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানতাম না। তুমিই ছিলে আমার একমাত্র ইষ্ট। দীক্ষা নেবার পর থেকে জেনেছি, ওটা মায়া। জগৎটা, সংসারটা সচ্চিদানন্দের। তুমি আমার সেই সচ্চিদানন্দের দান, তোমাকে প্রণাম করে তাঁকেই প্রণাম করছি আজ।

—নতুন কথা শুনছি গো।

—গুরু বলেছেন, এইটাই একমাত্র সত্য। আজ এই দিনটিতে তাঁকে আসতে বলেছিলাম, তিনি এসেছেন। যাই, তাঁর ভোগের আয়োজন করতে দেরি হয়ে গেছে।

—কিন্তু আমাকে সকালের ওষুধটা দিতেও দেরি করে ফেলেছ সুরমা।

—এই যাঃ! ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে। আনাই হয় নি। আচ্ছা আমি আনাচ্ছি।

* * *

—কি বুঝছ?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—সুরমা দেবী তো চলে গেছেন। এবার প্রাণ খুলে আমাকে বল না, তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না তোমার স্ত্রী—এ গর্বটা কি তোমার এখনও আছে?

—হ্যাঁ, সেটা এখন ভেবে দেখার বিষয় বটে।

—মানুষের দোষই ওই। ভাঙে তো মচকায় না।

—চুপ রমেন আসছে। আমার ছেলে।

* * *

—বাবা, কী বিপদ দেখেছ ?

—বিপদ ? কি বিপদ রমেন ?

—তোমার পা দুখানি বের কর। আগে প্রণাম করি। তারপর বলছি।

—দীর্ঘজীবী হও বাবা। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু বিপদটা কি ?

—বিপদটা ঘটিয়েছেন বিধাতা। তোমার জন্মদিনেই হচ্ছে সুনন্দার জন্মদিন।

—কে সুনন্দা ?

—বাঃ, সুনন্দাকে তুমি ভুলে গেলে ? তোমার বন্ধু অশোক সেনের সেই ধিঙ্গি মেয়েটা। যাকে তুমি আনন্দময়ী বলে ডাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আনন্দময়ী।

—সেই আনন্দময়ীর জন্মদিনও আজ। আমি লিখেছিলাম বাবার জন্মদিনও আজ। কি করে বর্ধমান যাই বল। তা এখন ট্রাঙ্ককল এসে উপস্থিত। আমি না গেলে উৎসবই নাকি হবে না।

—না না, তুমি যাবে বইকি বাবা। অশোক আমার বাল্যবন্ধু। আর ওই আনন্দময়ী সুনন্দা—একদিন আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে আসবে, এ আশাও আমি রাখি। তা বেশ, এ বাড়ির নেমন্তন্নের ভোজপর্বটা তো দুপুরে। ওটা মিটিয়ে দিয়েই তুমি বেরিয়ে পড়। বেলাবেলিই পৌঁছে যাবে বর্ধমানে।

—টেলিফোনে আমিও তাই বললাম বাবা। কিন্তু শুনছে না। বলছে এবেলাই এস। তুমি যাই বল বাবা, মেয়েটা বড় অবুঝ।

—তা বেশ, এখুনি রওনা হও। এদিককার ব্যাপার—আচ্ছা সে হবে এখন।

—সে তুমি ভেবো না বাবা। আমাদের ওই নতুন চাকরটা যেমন চালাক তেমনি চটপটে। ম্যানেজ করে দেবে। আচ্ছা বাবা, তা হলে আমি এই আটটা তেইশের গাড়িতেই—

—এসো।

* * *

—কি বুঝলে ?

—হ্যাঁ, বুঝছি।

—ছেলে তো চলল আটটা তেইশের গাড়িতে।

—যাক না। মমতা, আমার মেয়ে—ট্রেনটা বোধ হয় লেট আছে। নইলে এতক্ষণ এসে পড়বার কথা। বাঁকুড়া গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। সে এসে পড়লে একাই একশো। ওই বুঝি এসে গেছে।···কিন্তু—কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না মা।

—আমার প্রণাম নিন। আর চন্দনকাঠের এই খড়ম-জোড়া নিন। মমতাদি আমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁরই সহকারী শিক্ষয়িত্রী। আমার নাম রমা মিত্র।

—বেশ মা, বেশ। আশীর্বাদ করি সুখী হও। সার্থক হও। কিন্তু মমতা—সে এল না কেন ? ভাল আছে তো ?

—ও, সে জানেন না বুঝি ? স্কুলে এবার রেলের কনসেশান পাওয়া গেছে—ভারতের সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখার জন্য। স্কুলের শিক্ষিকারা সব দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছেন কাল। আজ আপনার জন্মদিন বলে প্রথমটায় মমতাদি যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু সেক্রেটারী চঞ্চলবাবুর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। জানেন, ভারি মজার লোক এই চঞ্চলবাবু। বলছিলেন অজন্তা ইলোরায় গিয়ে নিজেদের খুঁজে পাবে তোমরা।

—তা তুমি গেলে না যে মা ? নিজেকে হারাও নি বুঝি ?

—আমিও যেতাম। কিন্তু কিছুদিন থেকে মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বিদেশে চাকরি করি। এই ছুটিছাটাতেই যা একটু সুযোগ পাই বাপ-মায়ের সেবাশুশ্রূষার। ট্রেন থেকে সোজা আপনার এখানেই চলে এসেছি। হ্যাঁ, মমতাদি ওই খড়মজোরা আজই সকালে দেবার জন্য বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে। আচ্ছা, আমি তবে আসি।

—এসো মা, এসো। তোমার মা হয়তো তোমার পথ চেয়েই আছেন। না, আর দেরি করো না।

* * *

—কি, বুঝলে ?

—হ্যাঁ, এটা বুঝেছি, অনেকের কাছ থেকেই ধীরে ধীরে আমি দূরে চলে আসছি।

—আর তত কাছে আসছ আমার। ওই যে আবার কে আসছে।

*　　*　　*

—আরে, এসো এসো—তাপস এসো। তোমার এত কাজের মধ্যে মনে করে যে আজ এসেছ—

—আসব না ? তুমি কি বলছ সূর্যদা ? যত কাজই থাক্, তোমার জন্মদিনে আমাকে আসতেই হবে। আমার মাসিকপত্র 'মশালে'র নামকরণ করেছিলে তুমি। তোমার লেখার আগুনে তখন বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার কতটা কেটে গিয়েছিল তা জানে দেশের লোক। তোমরাই আশীর্বাদে দাদা, এবার আমার 'মশালে'র পূজাসংখ্যায় বেরুচ্ছে তিন তিনটে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এক ডজন বড় গল্প। কবিতা আমি গুণি না। জানই তো এই পূজা সংখ্যাটাই হল আমাদের নববর্ষ-সংখ্যা। দু লাইন আশীর্বাদ লিখে দাও দাদা।

—লিখে আব কি আশীর্বাদ করব। 'মশালে ব এই বার্ষিক সংখ্যার জন্যে একটা ছোট গল্প লিখে রেখেছি। ওটা নিয়ে যাও। ওই আমার আশীর্বাদ।

—দাদা, তুমি হলে গিয়ে বাংলাদেশের প্রবীণতম সাহিত্যিক। তোমাকে এই ছেলেছোকরার দলে মিশিয়ে মুড়ি-মিছরির একদর করতে পারব না। তা সে যে যাই বলুক। তুমি বরঞ্চ একটা আশীর্বচন লিখে দিলে এদের যাত্রাপথ সুগম হয়ে উঠত। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি বরঞ্চ সম্পাদকীয়তে লিখে দেব, তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই আমাদের নববর্ষের জয়যাত্রা শুরু হল। চলি। আমার আবার একগাদা প্রুফ। এমন হয়েছে—মরবার সময় নেই।

*　　*　　*

—কি বুঝলে ?

—হ্যাঁ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

—আমার ঘর অস্তাচলের ওপারে। কিন্তু তাই বলে খুব দূরে নয়। এক নিমেষেই যাওয়া যায়।

—কিন্তু আমাকে নেবার জন্যে তোমারই বা এত আগ্রহ কেন?

—সেটা তুমি ভুলে গেছ। এবং আশ্চর্য, যদি আজ আমি তা তোমাকে মনে করিয়ে দিই, বুঝেও তুমি না বোঝার ভান করবে। তোমার প্রতি জন্মদিনেই তো তোমাকে তা বলি? তুমি শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাসো।

—রাগ করছ কেন? বল না, শুনি। আমার প্রতি তোমার এ প্রেম কেন?

—কারণ তুমি ছিলে আমার। পৃথিবীর হাতছানিতে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছ আমার বুক থেকে। ফিরে পেতে চাই আমি তোমাকে।

—কি যে তুমি বল, আমি বুঝি না। পালিয়ে যদি এসে থাকি, ভুল করিনি কিছু। শুনেছি তুমি আলোহীন প্রাণহীন পাষাণ। তাই তোমাকে আমার এত ভয়। যেতে চাই না আমি এ পৃথিবী ছেড়ে। জীবনে যত দুঃখই আসুক, যত নৈরাশ্যই জমা হোক, সবাইকে ছাপিয়ে তবু থাকে এমন কোনও সম্পদ, যার জন্যে মনে হয়, যত কাঙালই আমি হই না কেন, তবুও আমি সম্রাট।

—হ্যাঁ, এ গর্ব মানুষ করে থাকে বটে। কিন্তু এটাও কি সত্য নয় যে মানুষেব কোনও সাম্রাজ্যই শেষ পর্যন্ত টেকে নি। ধ্বংস হয়ে গেছে। চুবমাব হয়ে গেছে। আমি শুধু বলতে চাই, তোমাব সাম্রাজ্যও যাবে। ভাঙন ধরেছে। প্রতি জন্মদিনে দেখতে আসি আর কত বাকী।

—বড় নিষ্ঠুর তুমি। শুধু নিষ্ঠুর নও, পৈশাচিক আনন্দ দেখছি তোমার চোখে। কিন্তু তুমি জেনো, তোমার আশা পূর্ণ হতে, আমাকে পেতে, তোমার এখনও ঢের ঢের বাকি।

—কোন্ অহংকারে এ কথা তুমি বলছ। চোখেব উপর দেখছ না কি একে একে তোমার সকল অহংকার চূর্ণ হচ্ছে?

—দেখছি। কিন্তু জানবে, এই পৃথিবী ধ্বংসের চেয়ে বড়—অনেক বড়। এত রূপ, এত রস, এত গান, এত গন্ধ আছে মানুষের জীবনে—ফুরবে না তা কোনদিন। একদিকে হবে ক্ষয়, আর একদিকে জয়। শোন মৃত্যু—

—বল।

—আমার বাড়ির দুয়ারে রাজপথের ধারে পড়ে আছে এক কুষ্ঠরোগী। কুৎসিত, কদাকার, বীভৎস। দেহের মাংস খসে পড়েছে। কিলবিল করছে পোকা। দেখছ?

—হ্যাঁ, আমি সবই দেখি।

—লোকটাকে মৃত্যুকামনা করতে শুনেছ কখনও?

—মুখে করেছে। কিন্তু মনের ইচ্ছা বাঁচতে। কিন্তু কেন? কেন বাঁচতে চায় বলতে পার?

—তবে শোন, কেন বাঁচতে চায়। দীনদুঃখী একটা ভিখারিণী রাতে এসে ওর কাছে বসে। ঘাগুলো ধুয়ে দেয়। ভিক্ষে করে যা পায় তা থেকে ওকেও খাওয়ায়। হয়তো প্রেম। হয়তো দয়া। কিন্তু এই-টুকু পাবার জন্যে ওর যেমন লোভ; ওইটুকু পেয়ে তেমনিই গর্ব। কেউ যদি ভিক্ষে না দেয়, লোকটা তাকে শুনিয়ে দেয়, নাইবা দিলে তুমি ভিক্ষে, ভিক্ষে দেবার লোক আমার আছে। ওর কাছে তবে তুমি হার মেনেছ মৃত্যু।

—আপাততঃ।

—অবশ্য আমি এত মূর্খ নই যে বলব আমরা অমর। মরব আমরা একদিন নিশ্চয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে লড়াই করে মরব বন্ধু। সগৌরবে লড়াই করব। আর তারই নাম হচ্ছে জীবন। ওই, কে আসছে! ক্রমাগত হারছি। তুমি এগিয়ে আসছ। ভাবছি, আজ কি তোমাকে রুখতে পারব না আমি!

—দেখ!

* * *

—আরে, এস এস বিপদভঞ্জন। তোমার কথা আজ যেন কেন বারবার মনে হচ্ছিল। না না, কোনও মামলাটামলায় পড়ি নি। ভাবছিলাম, তুমি আর অমি একবয়সী। জন্মদিনে তাই তোমার কথা মনে হচ্ছিল।

—আরে, আমারও তো মন ছটফট করছিল তোমার কাছে ছুটে

আসতে। কিন্তু তার কি জো আছে? আসব বলে বেরিয়েছি এমন সময় মক্কেল এসে উপস্থিত। পুলিশ-কেশের আসামী। তুমি বলেছিলে সকাল সকাল আসতে, কিন্তু পড়ে-পাওয়া টাকা ফেলে আসতে পারি নে। কাজেই বসতেই হল।

—না না, টাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন রাখতে তোমার ক্ষতি হলে আমারই কি ভাল লাগত?

—তুমি ভাই আমার জন্যে যেসব ক্ষতি সহ্য করেছ, আমার কোনও ক্ষতি দিয়েই তাকে মাপা যাবে না সূর্যদা। ছিলাম বিপ্লবী। জেল খেটেছি, নতুবা এ-গর্তে সে-গর্তে পালিয়ে থেকেছি, পূরো সাতটি বছর। এই সাত-সাতটি বছব তুমি আমায় স্ত্রীপুত্রের মুখে ভাত জুটিয়েছ।

—থাক্, থাক্, ওসব কথা থাক্। কেসটা বেশ কিছুদিন চলবে? মানে, কেসটায় টাকা আছে তো?

…হ্যাঁ, বেশ টু-পাইস পাবাব কেসই এটা। আসামী দুজন। একজন তো খুবই বড়লোক। আর একজন অবশ্য খুবই গরীব। তা মামলার খরচ অবশ্য বড়লোকের ছেলেটিই চালাবে। কিন্তু যা চার্জ, শুনে আমার গা ঘিনঘিন করছে।

—বল কি! কি কেস হে?

—জঘন্য। গরীব লোকটি হচ্ছে একটি বুড়ো বাপ। আর বড়লোকের ছেলেটি হচ্ছে একটি নরপশু। বুড়ো তার ষোড়শী মেয়েটিকে নিজে নিয়ে গেছে এক পার্কের ঝোপে। ওই পশুর হাতে তুলে দিয়ে, দূরে পাহারা দিয়েছে নিজে, যাতে কেউ ওদিকে না যায়।

—আশ্চর্য! বুঝছি, পেটের দায়ে বুড়ো এই—কিন্তু ঘেন্নায় মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।…কে, ওখানে কে হাসছে?

—কই? হাসছে আবার কে!

—ও। না—হ্যাঁ…তা এরা ধরা পড়ল কি করে?

—ওই মেয়েটারই কোনও 'লাভার' হয়তো ব্যাপারটার গন্ধ পেয়ে অ্যান্টি-করাপ্‌শান্ পুলিসকে পূর্বেই খবরটা দিয়ে রেখেছিল—কাজেই এরা একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।

—কিন্তু মানুষ কি এত নীচে নেমে গেছে। না না, হয়তো ওই 'লাভার'ই পুলিসকে হাত করে কেসটা সাজিয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে। ডিফেন্সও তাই হবে। কিন্তু আসামীরা আমার কাছে কবুল করেছে, ঘটনাটা সত্য। বড়লোকের ছেলেটি পাঁচশো টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, আমায় বাঁচান উকিলবাবু।

—তুমি বিপদভঞ্জন বোস। আশা করি ওদেরও বাঁচাতে পারবে, আর নিজেও বেঁচে যাবে ওদের টাকায়। তোমারও তো সামনে মেয়ের বিয়ে।

—না ভাই, এ কেস আমি নিই:নি।

—নাওনি!

—না। আমিও মেয়ের বাপ।···ঘেন্না করল।

—কিন্তু তোমার মেয়ের বিয়েতে টাকার এত দরকার। কেসটা তুমি নিলে না?

—না। কেসটা শোনা অবধি নিজেকে কেমন যেন অশুচি বোধ হচ্ছে। তাই ছুটে এলাম একটা মহৎ লোকের পরশ পেতে।

—আরে আরে, একি! একেবারে যা:কে বলে আলিঙ্গন যে। তা ভালই, আমার জন্মদিনে তোমার মত একটা খাঁটি লোকের ছোঁয়া পেলাম। জন্মদিন আমার সার্থক হল বিপদভঞ্জন। একি, চললে যে!

—কাছারির বেলা হয়ে গেছে।

—আরে, মিষ্টি মুখ করে যাবে না?

—টাকার বড় দরকার। আজ একটা জটিল মামলা আছে। সকাল সকাল গিয়ে তদ্বির করতে হবে। মিষ্টি খাব বিকেলে এসে।

* * *

—কি? মরতে ইচ্ছে হয় বলছিলে যে?

—ও, তাই বুঝি তুমি হোহো করে হাসছিলে? ভাগ্যিস আর কেউ শুনতে পায় নি। কিন্তু হোহো করে জয়ের হাসি হাসবার পালা বোধ হয় এবার আমার। মানুষ আজ কত নীচে নেমে গেছে এ কথাও যেমন

ঠিক, মানুষ আজ কত উপরে উঠতে পারে তাও তো দেখা গেল বন্ধু। এমন বন্ধু-ভাগ্যে গর্ব করে বাঁচা চলে। চলে নাকি ?

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছে এ-বছরটিতেও তোমাকে আমি পাব না। আচ্ছা আজ তবে চলি। ও, না, আবার কে আসছে। আচ্ছা, তবে একটু বসেই যাই। দেখি, ইনি এসে তোমার পরমায়ু বাড়ান কি কমান।

* * *

—অমল যে! এসো এসো। এবার দেরি যে! বাঃ, কি সুন্দর সব ফুল। আচ্ছা অমল, তোমার শ্যামলী-মা তিনি তো আর শ্যামলী নেই, পাকা বুড়ি হয়েছেন। তা তিনি এখনও কি নিজের হাতে তাঁর বাগানটির পরিচর্যা করেন ? না না, এ ফুল আমার পায়ে রাখছ কেন ? দাও, আমার হাতে দাও।

—কিন্তু শ্যামলী মা এ ফুল আপনার পায়ে রেখে আপনাকে প্রণাম করতে বলেছেন আমায়। তার আদেশ অমান্য করাব সাহস আমাদের নেই সার।

—ও, তোমার শ্যামলী-মা একটি বাঘা বুড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছেন দেখছি। বেশ, তাঁকে বলো, আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশীবাদ করছি—তাঁর জীবন আরও সার্থক হোক। তোমাকে আশীর্বাদ করছি—দীর্ঘজীবী হও। হ্যাঁ, যে কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম,শ্যামলী তাঁর বাগানের কাজ এখনও কি নিজের হাতেই করেন ? ফুলের বাহার দেখে তাই কিন্তু মনে হচ্ছে অমল।

—অনাথ আশ্রমের অত বড় বাগান। এ-বয়সে অত বড় বাগানের কাজ তাঁকে আমরা কেন দেব করতে—যেখানে আমরা তাঁর শত শত ছেলেমেয়ে রয়েছি। তবে জানেন সার্, ওঁর নিজের ঘরের সামনে যে ছোট্ট বাগানটি, সেখানে কারও ঢোকার হুকুম নেই। তার কাজ করেন তিনি নিজেই। আচ্ছা সার্, শুনেছি, ওই বাগানের ফুলগাছগুলো নাকি আপনার নিজের হাতের ?

—শুনলেই হল ? ওরে বোকা ছেলে, কি করে তা হয় ? তোদের শ্যামলী-মা'র ওই বাড়িতে থেকে আমি যখন এম, এ, পড়ি তখন আমার

বয়স ছিল কুড়ি-একুশ। শ্যামলী তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে। সে আজ কতকালের কথা বল্ দেখি। হ্যাঁ, তা বছর চল্লিশ হবে। চল্লিশ বছর বুঝি কোনও ফুলগাছ বেঁচে থাকে রে বোকা ছেলে!

—না না, সে আমরা শুনেছি। এখনকার গাছগুলো নাকি আপনার সেই গাছগুলোর কাচ্চা-বাচ্চা।

—এসব কে বলেছে রে অমল? শ্যামলী বুঝি?

—না না, তিনি বলেন নি। তবে এ কথা কিন্তু আর সবাই বলে। আজ যখন এই ফুলের ঝাঁপিটি আমার হাতে তুলে দিলেন তখন আমি খুব সাহস করে শ্যামলী মাকে জজ্ঞেস করলাম, আমরা যা শুনি সেটা সত্যি কি? আমার কথায় তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, এ ফুল আমার গুরুদেবের পায়ে রেখে তাঁকেই জিজ্ঞেস করিস অমল।

—বটে, এ কথা বলেছেন শ্যামলী? আর কি বলেছেন শ্যামলী?

—বেশী কথা আজকাল তিনি বলতে পারেন না। তাঁর যে খুব অসুখ।

—অসুখ! জানি নে তো। কী অসুখ?

—সে জানার উপায় নেই। মুখ বুজে সয়ে থাকেন সব যন্ত্রণা। আজকাল কথা বলেন কম, কিন্তু মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে।

—আমাকে যেতে বলেছেন?

—কি করে জানলেন সার্?

—আমার মন বলছে।

—শ্যামলী-মা বলেছেন, তাঁর আশ্রমে এসব ফুলের চেয়েও আরও শত শত সুন্দর ফুল ফুটেছে। আপনাকে গিয়ে দেখে আসতে বলেছেন। আপনি নাকি সেখানে বহুকাল যান নি। আজ যেতেই হবে আপনাকে। আশ্রমের গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলুন সার্।

—সেই শত শত ফুলের একটি তো দেখছি তুমি। যাব, আমি যাব। তুমি পূজোর ঘরে গিয়ে প্রসাদ নাও। আমি তৈরি হচ্ছি।

* * *

—এবার কি বুঝছ?

—বুঝছি তোমার পরমায়ু অনেক। কিন্তু এ কি সেই শ্যামলী যে ছিল একটি ধনী পতিতার মেয়ে, যার গার্জেন-টিউটর ছিলে তুমি?

—হ্যাঁ বন্ধু।

—তা দেখছি, তোমার শিক্ষাতেই পতিতার মেয়ে হয়েছে পতিতপাবনী।

—হ্যাঁ বন্ধু। জীবনে এইটেই আমার সবচেয়ে বড় গর্ব।

—আর গুরুটিকেও সে ভোলে নি।

—হ্যাঁ বন্ধু।

—গুরু আর শিষ্যা তোমাদের দুজনের জন্যেই দেখছি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরও অনেককাল। তা করব। আনন্দের সঙ্গেই করব। হ্যাঁ, এই আশীর্বাদ করেই মৃত্যু আজ বিদায় নিচ্ছে। চলি আমি আমার অন্ধকাররাজ্যে—যাত্রা কর তুমি তোমার আনন্দলোকে। বিদায়।

—বিদায়।

৯ ভাদ্র ১৩৬৭

শনিবারের চিঠি
শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ—১৩৬৭

এক-দুই-তিন

[বালিগঞ্জে ক্যাপ্টেন সেনের বাসভবন। রাত্রিবেলা। ক্যাপ্টেন সেন তাঁহার সদ্য-পরিণীতা স্ত্রী মেঘনা সেনকে লইয়া ডাইনিং টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন]

সেন ॥ এ আমাদের পৈতৃক বাড়ী। পছন্দ হল কি মেঘনা ?

মেঘনা ॥ তা মন্দ কি, তবে বড় পুরনো। যদি কিছু মনে না কর বলব ?

সেন ॥ বল মেঘনা, বল।

[বাহিরে হঠাৎ একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল]

মেঘনা ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] ও কি !

সেন ॥ একটা নেড়ী কুত্তা।

মেঘনা ॥ কী বিশ্রী ডাক !

সেন ॥ ওটাকে আজ সকালে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি আবার এসেছে। বোধহয় অনেক কাল এ বাড়িতে আছে। হ্যাঁ, বাড়িটা সম্বন্ধে তুমি যেন কী বলতে গিয়ে থেমে গেলে ?

মেঘনা ॥ বলছিলাম কি, বাড়িটাতে কেমন যেন একটা ভুতুড়ে ভাব আছে।

সেন ॥ আমরা কেউ থাকি না তো। আমার তো সারাটা জীবন বিদেশেই কেটেছে। বিয়ে করতে কলকাতায় আসতে হল। তাই

কতকাল পর আসা হল এই পৈতৃক ভিটায়। খাবার দিতে বলেছি, এস বসি।

[বাহিরে পুনরায় কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। মেঘনা চেয়ারে বসিল বটে কিন্তু ক্যাপ্টেন সেন ছুটিয়া জানালায় গিয়া কুকুরটির উদ্দেশ্যে বলিলেন—]

সেন ॥ I say, Neri, stop.

মেঘনা ॥ (খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কুকুরটা খুব বুঝল!

সেন ॥ ও, বেশ, স্পষ্ট বাংলাতেই বলছি—নেড়ী, আমি কারও অপরাধ দু বারের বেশী ক্ষমা করি না। তিনবার অপরাধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করি। আমি ক্যাপ্টেন সেন।

মেঘনা ॥ My God—তুমি কি বলছ?

সেন ॥ আমার যা স্বভাব তাই বলছি। নেড়ী, বেশ লক্ষ্মীটির মত চুপ করে থাক। আমি নতুন বিয়ে করে বউ ঘরে এনে তুলেছি আজ। কেলেঙ্কারি করো না এখন। আমাদের একটু আরাম করে খেতে দাও।

[জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া ডাইনিং টেবিলে বসিলেন]

সেন ॥ সিমলা গিয়ে দেখবে মেঘনা, সেখানে আমার দু-দুটো অ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর আছে। কিন্তু দেখবে তারা কি ভদ্র!

মেঘনা ॥ সিমলা খুব সুন্দর, না?

সেন ॥ সে তুমি নিজে গিয়ে দেখে বলবে। কিন্তু খাবার দিতে দেরী করছে কেন? (চীৎকার করিয়া ডাকিলেন) বয়!

মেঘনা ॥ একটা কথা বলব?

সেন ॥ বল। বল না।

মেঘনা ॥ তুমি বড্ডো চেঁচিয়ে ডাক। আমি চমকে উঠি।

সেন ॥ (হাসিয়া) ও। আচ্ছা।

[বয়ের প্রবেশ]

সেন ॥ আমি দু-বারের বেশী কারও কোন অপরাধ ক্ষমা করি না। তিনবারের বার গুলি করি। পনের মিনিট আগে তোমাকে খানা দিতে বলেছিলাম। এখনও খানা এল না। মনে রাখবে এটা হল এক। আর দশ মিনিটের মধ্যে খানা না এলে সেটা হবে দুই।

বয় ॥ জি ।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল)

মেঘনা ॥ রিভলবারটা তাই তুমি সব সময় কাছে রাখ ?

সেন ॥ হ্যাঁ। না না, তুমি ভয় পেয়ো না।···আজ রাতটা বড় বিচিত্র মনে হচ্ছে আমার।

[নেড়ী কুত্তাটি বাহিরে আবার ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ (চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া নেড়ীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া) নেড়ী, এক—

[সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া মেঘনার সহিত আলাপ শুরু হইল]

সেন ॥ বিচিত্র নয় কি মেঘনা ? দু-দিন আগেও তোমাকে চিনতাম না কিন্তু কাল তোমাকে বিয়ে করার পর থেকে মনে হচ্ছে তোমাকে যেন কতকাল চিনি, কতকাল জানি।

মেঘনা ॥ আমিও তাই ভাবছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে ঃ পাত্রী চাই। আমার ফটো পঠিয়ে বাবা লিখলেন তোমাকে চিঠি। কিন্তু বাবা স্বপ্নেও হয়তো ভাবেন নি যে তোমার মত একজন জবরদস্ত মিলিটারী অফিসার সেই চিঠি পেয়ে, ফটো দেখে ঝড়ের মত এসে বলবে—

সেন ॥ ওগো খুকী, আজকেই তোমার বিয়ে। এটা হচ্ছে মিলিটারী ট্রেনিং। বুঝলে খুকী ?

মেঘনা ॥ খুকী ? (খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল) আমি খুকী ?

[বাহিরে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নেড়ী, দুই। (আবার বসিয়া পড়িলেন)

মেঘনা ॥ একটু জল।

সেন ॥ খাবে ? বয় ! (হাতঘড়ি দেখিয়া) আচ্ছা, আমি দিচ্ছি।

[টেবিলে রক্ষিত জলপাত্র হইতে গ্লাসে জল ঢালিয়া মেঘনাকে দিলেন ॥ মেঘনা জল পান করিল]

সেন ॥ তোমার ক্ষিধে পেয়েছে honey. (হাতঘড়ি দেখিয়া) খাবার এল বলে।

মেঘনা ॥ আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

সেন ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমার কথা শুনতেই তো আজ চাই মেঘনা।

মেঘনা ॥ তুমি লড়াইয়ে গেছ ?

সেন ॥ নিশ্চয় । এই তো সেদিন—কাশ্মীরে ।

মেঘনা ॥ কত লোক মেরেছ তুমি ?

সেন ॥ অগুন্‌তি । অগুন্‌তি । লেখাজোখা নেই ।

মেঘনা ॥ আচ্ছা, তোমার মনে এতে এতটুকু কষ্ট হয় না, না ?

সেন ॥ কষ্ট ? ফুঃ ! I am a military man.

[সঙ্গে সঙ্গে মেঘনা জলপাত্র হইতে জল ঢালিয়া খাইতে উদ্যত হইল]

মেঘনা ॥ বিশ্রী গরম পড়েছে ।

সেন ॥ কিন্তু অত জল খাওয়াও বিশ্রী । এটা এক নম্বর দোষ ।

মেঘনা ॥ অ্যাঁ !

সেন ॥ হ্যাঁ ।

[বাহিরের কুকুরটি আবার ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল । সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন সেন রিভালবার লইয়া বাহিরে ছুটিলেন । সঙ্গে সঙ্গে মেঘনার হাত হইতে জলের গ্লাস সশব্দে পড়িয়া গেল । সে ভয়চকিতা হইয়া কক্ষান্তরে ছুটিয়া গেল । বাহিরে গুলির শব্দ এবং কুকুরের আর্তনাদ শোনা গেল । পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন সেন ডাইনিং টেবিলে ছুটিয়া আসিলেন । সঙ্গে সঙ্গে বয় খাবারের একটি ট্রে লইয়া ঘরে ঢুকিল]

সেন ॥ এ কি ! (ডাকিলেন) মেঘনা !

বয় ॥ মেমসাব চলা গিয়া হুজুর ।

সেন ॥ কাঁহা চলা গিয়া ?

বয় ॥ মালুম নেহি হুজুর ।

সেন ॥ মালুম নেহি ? কিঁউ ? ইয়ে তুম্‌হারা দো নম্বর কসুর হুয়া ।

বয় ॥ মেমসাব ভাগ গিয়া ।

সেন ॥ ভাগ গিয়া ! তব্ কিউ নেই পাকড় লিয়া ? ইয়ে তুমহারে তিন ।

[সঙ্গে সঙ্গে রিভালবার দিয়া বয়কে গুলি করিলেন । কিন্তু দেখা গেল বয় যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে । এবং বাহিরে কুকুরটিও পুনরায় ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল]

সেন ॥ মেমসাব কো পাকড়াও। বলো, ইয়ে হামারা ব্লাঙ্ক ফায়ার। ফাঁকা আওয়াজ।

বয় ॥ জি সরকার। ইয়ে তো হাম দশ বরষ দেখতা হ্যায়। আপ তো নেহেরুজীকি চেলা হ্যায়।

সেন ॥ Yes, this is our military tactics. We will be firm : we will fire : but blank. মেমসাব কা পাকড় লে আও জলদি।

[যবনিকা]

শনিবারের চিঠি
শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ—১৩৬৭

পলায়ন

স্থানটি ঠিক চেনা যাইতেছে না। ধূসর কুয়াশায় যেন চারিদিক আচ্ছন্ন রহিয়াছে। কতকগুলি নরনারীকে তাহার মধ্যে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

—ও ড্রাইভার, এ আমরা কোথায় এলাম?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—মোটরবাসটা চলছে কি?

—ড্রাইভার, তুমি চুপ করে রয়েছো কেন?

—আমি ষ্টিয়ারিংটা খুঁজে পাচ্ছি না।

—তবে কি গাড়ী চলছে না?

—হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে। সব যেন কেমন থেমে গেছে।

—বাসটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সেই যে থেমে গেলো—

—হ্যাঁ, তারপর থেকেই সব যেন কেমন চুপচাপ।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন খুব বড় রকমের একটা এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

—কিন্তু কারো তো খুব চোট লেগেছে বলে মনে হচ্ছে না।

—না না, এখন মনে পড়ছে আমরা সবাই ভীষণ চীৎকার করে উঠেছিলাম।

—আমরা কি মোটরবাসটার ভিতরেই রয়েছি?

—কি জানি, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

—আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

—আমরা যেন কোথায় যাচ্ছিলাম?

—তাইতো! ঠিক মনে করতে পারছি না তো!

—খুব বড়ো রকমের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা মনে পড়ছে। আমি ডাক্তার বলেই বলতে পারছি এ ধরনের দুর্ঘটনায় অনেক সময় স্মৃতি লোপ পায়।

—সে আর বেশী কথা কি ডাক্তার। অনেকে অন্ধ হয়ে যায়।

—আমার পিসিমা ছাত থেকে পড়ে গিয়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। সারা জীবনে আর মুখ খোলেননি।

—কিন্তু আমার ডাক্তারি অভিজ্ঞতায় বলছি, ঠিক মতো চিকিৎসা হলে এ রকম কেস্ ভালো হয়। আপনার পিসিমার চিকিৎসা করিয়েছিলেন ?

—না।

—কেন ?

—পিসেমশাই বললেন, এ শাপে বর হয়েছে। হ্যাঁ, সেই থেকে আমার পিসেমশাইয়ের শান্তির সংসার।

—ড্রাইভার, ও ড্রাইভার, ষ্টিয়ারিং ধরেছো ?

—কোথায় ষ্টিয়ারিং ! গাড়ীটাই খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কি !

—বলে কি ?

—গাড়ী খুঁজে পাচ্ছে না !

—য়্যা ?

—হ্যাঁ। আমি গাড়ী খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কি ?

—তবে আমরা কোথায় ?

—তাইতো ? তবে আমরা কোথায় ?

—অন্ধকারটা কেটে না গেলে কিছুই বোঝা যাবে না।

—এখন রাত কটা ?

— কি জানি ঘড়ি রয়েছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।

—আমার হাতে রেডিয়াম ডায়েলেব ঘড়ি। তাও তো টাইম দেখতে পাচ্ছি না।

—য়্যাকসিডেণ্টে হয়তো ঘড়িটারও বারোটা বেজেছে।

—য়্যাক্সিডেণ্ট বলছো বটে কিন্তু কেউ খুব চোট পেয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না!

—যন্ত্রণায় কেউ কাতরাচ্ছে না তো!

—আমার মনে হচ্ছে, অনেকে বোধহয় মূর্ছিত হয়েই রয়েছে বিশেষ মেয়েরা, আর বাচ্চারা।

—ওগো শুনছো? তুমি কোথায়?

—এতক্ষণ পর খোঁজ করছো। তাও ভালো।

—খুব চোট পেয়েছো কি?

—কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বেশী আঘাত পেলে প্রথমটায় সব অসাড় হয়ে যায়।

—ঠিক ঠিক, আমাদের হয়তো তাই হয়েছে।

—এখন যখন জ্ঞান হয়েছে, ব্যথা বেদনা সুরু হোলো বলে।

—না না তবে জ্ঞান না হওয়াই ভালো।

—তা হলে অজ্ঞান হতে আর একটা দুর্ঘটনা চাই। লাফিয়ে পড়বো নীচে?

—পাগল না মাথা খারাপ?

—ও ড্রাইভার, তুমি কোথায়? সাড়া পাচ্ছি না যে।

—আমার গাড়ি কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না।

—আমরা পাহাড়ী পথ দিয়ে চলছিলাম মনে পড়ে গেছে।

—গাড়ীটা বোধহয় পাহাড় থেকে খাদে পড়ে গেছে।

—সেই সঙ্গে আমরাও কি তবে—

—না না, আমরা বেঁচেই আছি। কিন্তু কি করে বাঁচলাম বুঝছি না।

—যাকে বলে মিরাক্‌ল্।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে, মিরাক্‌ল্। দৈব।

—ঠাকুমার কথা মনে পড়েছে। সব সময়ে তিনি বলতেন, রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে?

—এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম না পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ নায়াগ্রা ফল্‌স্—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও পড়েছি একটি ছেলে ঐ জল-প্রপাতে ঝাঁপ দিয়েছিলো; কিন্তু পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, ছেলেটা মরেনি।

—হ্যাঁ বেঁচে গেছে।

—হ্যাঁ, সব কাগজে লিখেছে নায়েগ্রার ইতিহাসে এমনটি আর দেখা যায়নি।

—তবেই বুঝুন, সেক্‌স্‌পিয়ার মিথ্যা লেখেননি

"There are more things in heaven and earth than are dreamt of in our philosophy."

—যাক্ প্রফেসার এতক্ষণে মুখ খুলেছে। লেক্‌চার সুরু হয়ে গেছে।

—রাখুন মশাই আপনাদের লেকচার। এখন বলুন দেখি আমরা কোথায় এলাম ?

—ঐ হোলো পরের কথা। আগের কথাটাই আগে বলুন। আমরা কোত্থেকে আসছি মনে করতে পারছেন কেউ ? আমি তো পারছি না।

—তাই তো কোথায়ই বা যাচ্ছিলাম—কেন বা যাচ্ছিলাম ?

—দেখুন দেখি, কেউ যদি কিছু মনে করতে পারেন, বলুন তিনি।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

—অন্ধকারটা যেন একটু একটু কাটছে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, একটু একটু আলো ফুটছে।

—আমরা যেন পরস্পরকে আবছা আবছা দেখছি।

—গাড়ীটাকে কি দেখা যাচ্ছে ?

—ও ড্রাইভার বলো না গাড়ীটাকে কি দেখতে পাচ্ছো ?

—কই, না।

—তবে ওটা খাদে পড়ে গেছে।

—যাক। সব চেয়ে বড়ো কথা আমরা বেঁচে আছি।

—আর কেউ যখন কাতরাচ্ছে না তখন না তখন বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছি।

—কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হলো ?

—রাখে হরি মারে কে ? মারে হরি রাখে কে ?

—নায়েগ্রা ফল্‌স্ এ ঝাঁপিয়ে পড়েও ছেলেটা বেঁচে গেছে। কাগজে লিখেছে সে এখন মাঠে মাঠে গরু চরাচ্ছে।

—আলো আলো উষার আলো ফুটে উঠছে।

—হ্যাঁ, এইবার আমরা সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।

—কিন্তু কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ঝাঁকুনি খেয়ে এদিকে ওদিকে সব ছিটকে পড়েছি। দূর হয়েছে নিকট, আর নিকট হয়েছে দূর।

—আমাদের স্মৃতিও যেন এই আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ফিরে আসছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা এই ক'জন কেন যেন পালাচ্ছিলাম।

—কোত্থেকে পালাচ্ছিলাম ?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ১লা জুলাই মাইনে পেয়েছিলাম।

—[হাসিয়া] ১লা জুলাই! স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে পড়েছে দেখছি।

—না না, আমার ভুল হয়নি। ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই মাইনে পেয়েছিলাম, তার পরেই সুরু হলো উঃ সে কি অরাজকতা! ৩-ই জুলাই এই মোটর বাসে আমরা পালাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ আসামের জোড়হাট থেকে।

—[বজ্রকণ্ঠে] চুপ! চুপ!

[নিস্তব্ধতা]

—কুয়াশাটা যেতে যেতেও যাচ্ছে না।

—আলো—আলো—আর একটু আলো পেলে বড়ো ভালো হতো।

—কিন্তু এ আমরা কোথায় এসেছি ?

—তাই তো! এটা যে কোন্ জায়গা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

—কিন্তু জায়গাটা বেশ উঁচু এটা মনে হচ্ছে।

—এরোপ্লেন থেকে যেমন দেখা যায় এ যেন আমরা তাই দেখছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ব্রহ্মপুত্র নদটা একটা রূপোর তারের মতন দেখা যাচ্ছে।

—লোকজন, গাছপালা—বোধহয় দেখছি, কিন্তু চিনে ওঠা দায়।

—তাই তো ? এ আমরা কোথায় আছি!

—আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো ?

—হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা শুনলাম। আমরা বোধ হয় স্বপ্নই দেখছি।

—[হাসিয়া] স্বপ্ন দেখছি এতগুলো লোক একসঙ্গে।

—স্বপ্ন দেখছি হয়তো একজনই। সবাইকে নিয়ে একটা মস্ত স্বপ্ন দেখছি।

—আশ্চর্য ! সবারই তাই মনে হচ্ছে।

—হোক্ তাতে ক্ষতি নেই। আমরা বেঁচে আছি এই যথেষ্ট।

—হ্যাঁ, আর বেশ ভালোভাবেই বেঁচে আছি মনে হচ্ছে।

—ড্রাইভার, ও ড্রাইভার ! তোমার মোটর বাসটি কোথায় খোঁজ পেয়েছো ?

—না।

—একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছে এটা তোমার মনে পড়ছে ড্রাইভার ?

—হ্যাঁ, কি যেন ভাবতে ভাবতে আমি গাড়ী চালাচ্ছিলাম, পথটা গিয়েছিলো বেঁকে। সাংঘাতিক কিছু ভাবছিলাম, তাই বাঁকটা আমার চোখে পড়লো না—পাপের ফল হাতে হাতে পেলাম।

—পাপের ফল ? তুমি কি বলছো ড্রাইভার ?

—হ্যাঁ, পাপের ফল। কথাটা আর মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারছি না। বলে ফেলতে পারলে মনটা তবেই হয়তো হালকা হবে। আমি বলবো।

—বলো, বলো।

—আমাদেরও এখন অনেক কিছু মনে পড়ছে।

—এখানকার আকাশে বাতাসে কি কোন যাদু আছে ? মনের কথা টেনে বের করতে চাইছে।

—ড্রাইভার, তুমি অমন করছো কেন ?

—আমাব বমি পাচ্ছে। মনের পাপটা বমি হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি তোমাদের সবাইকে নির্জন পাহাড়ের বুক টেনে এনে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।

—সে কি ! তুমি আমাদের বলেছিলে যদি বাঁচতে চাও শিগ্‌গীর আমার মোটর বাসে ওঠো ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে । 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটছিলো আমাদের ঐ অঞ্চলে ।

—এই ছাখো, দিক্‌-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, পালাচ্ছিলাম, কিন্তু কেন পালাচ্ছিলাম কিছুতেই এখানে মনে করতে পারছিলাম না । তোমার এই কথায় এখন সব কিছু মনে পড়ছে ।

—ড্রাইভার, ড্রাইভার, ও তুমি কি করছো ? তোমার গলাটা অমন করে টিপে ধরেছো কেন ?

—আমাদের নেতাদের কথায় আমি ভুলেছিলাম যে গেল বন্যায় যখন আমার বাড়ীঘর গিয়েছিলো ভেসে, তখন সপরিবারে আশ্রয় পেয়েছিলাম এক বাঙালীর বাড়ীতে । অথচ সেই বাঙালীদের মারবার জন্যই এমন একটা মহত্ত্বের ফাঁদ পাতলাম যে তোমরা সবাই আমার কথায় ভুলে আমার বাসে উঠে ভাবলে পালিয়ে বাঁচছো তোমরা ।···এ জীবন আমি রাখবো না । আমি মরতেই চাই । শ্বাসরোধ করে মরবার জন্য এত চেষ্টা করছি কিন্তু আমি পারছি না । কী আশ্চর্য ! গলাটা এমন করে টিপে ধরছি কিন্তু কোন ব্যথা লাগছে না আমার । আমার হাতের জোর কি কমে গেলো ? তোমরা কেউ দয়া করে এসে আমাকে মারতে পারো ?

—না, না । তুমি মরবে কেন ? পাপের প্রায়শ্চিত্ত মরে হয় না । মৃত্যুর পর তো সব শান্তি ।

—তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরেছো এতেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে ।

—আমাদের সকলেরই ছিলো সোনার সংসার । হীন স্বার্থের ষড়যন্ত্রে ভেঙেচুরে হয়ে গেছে খানখান । বাকী ছিলো প্রাণটা ।

—আমার বাসে তুলে নিয়ে এসেছিলাম—সেই প্রাণটাও নিতে । পাপের ফল হাতে হাতে পেয়েছি । বাস্‌টা আমার গেছে । প্রাণটা গেলে বাঁচতাম ।

—থাক্, তবু তো আমরা সব বেঁচে গেছি। এই ঢের।

—না। আমরা পালাতে চেয়েছিলাম কারণ বাঁচাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো দুঃখের। এ বাঁচার চেয়ে মরাই ছিল ভাল, অন্ততঃ আমার।

—আমারও অনেকটা তাই, বুঝলে প্রফেসর। আচ্ছা কি দুঃখে তুমি পালাতে চেয়েছিলে বলো তো শুনি ?

—হ্যাঁ, কী আশ্চর্য পরিবেশে এখন এখানে আছি যে মনের সব গুপ্ত কথা আপনা আপনি বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনে হচ্ছে তাতেই পাবো শান্তি। নইলে আমার কাহিনী এত লজ্জার যে সভ্য সমাজে তা বলবার মতো নয়।

—না না, বলো প্রফেসর। আমরাও আমাদের কথা বলবো। মনে হচ্ছে বললেই শান্তি।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো ডাক্তার। আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ যেন গভীর অরণ্য। তোমরা আমার চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছো এক একটি বৃক্ষ। তাই একথা বলতে আজ আমার কোনো লজ্জা হচ্ছে না যে—ঐ যে আমার স্ত্রী ওখানে বসে আছেন—উনি আমারই শয্যা করেছেন কলঙ্কিত—আর তা করেছেন আমারই এক প্রিয় ছাত্রের সঙ্গে।

—কী আশ্চর্য! এ যে কি পরিবেশ! এ পরিবেশে না জানি কি যাদু আছে—আমার স্বামীর এই অভিযোগ আমি অস্বীকার করতে পারছি না—অস্বীকার করছি না।

—হয়তো এই অবৈধ সংসর্গের কারণও ছিলো প্রফেসর। তুমি হয়তো তোমার অধ্যাপনা নিয়ে এমন মশগুল থাকতে যে স্ত্রীর প্রতি তোমার সব কর্তব্য যথাযথ পালন করনি তুমি।

—আপনি মিথ্যা বলেননি। আমার মনের ক্ষুধা উনি না মিটিয়ে ছিলেন তা নয় কিন্তু আমার কোলে সন্তান দিতে অক্ষম ছিলেন উনি।

—অস্বীকার করছি না। আইনে এজন্য বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম বিবাহ বিচ্ছেদ হোক্। কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি তাতেও স্বীকৃত হওনি।

—না, সে লজ্জাটা আমি বরণ করতে চাইনি। তাছাড়া আরও একটি

কারণ ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তোমার ছাত্রটিকেও হারাতাম আমি। কারণ তার সামাজিক অবস্থা ছিল না এমন যাতে স্বামী বলে তাকে গ্রহণ করতে পারি আমি।

—আমি সেটা স্পষ্ট বুঝেছিলাম। তোমাকে খুন করতে ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। সুযোগ খুঁজছিলাম। এমন সময় এলো এই 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। পরিপূর্ণ অরাজকতা। ভাবলাম, এই আমার সুযোগ। বাঁচাবার নাম করে তোমাকে নিয়ে উঠলাম আমি এই মোটর বাসে। তোমাকে মারতে। নির্জন পথে কোনখানে তোমাকে নিয়ে নেমে গিয়ে।···ডাক্তার শুনছ ?

—হ্যাঁ, শুনছি। আর ভাবছি আমার নিজের কথা। প্রফেসর—তোমরা জানো আমি ডাক্তার। এবং খুব দয়ালু ডাক্তার। কী অসমিয়া কী বাঙালী সকলের মুখে একটি কথা : আমার মায়া মমতার অন্ত নেই। আমি এক দেবতা।

—এ কথা আপনাকে নিজ মুখে বলতে হবে না স্যার। এখানে আমরা যারা আছি, প্রত্যেকটি লোক এ কথা জানে।

—কিন্তু এ কথা কি তোমরা জানো যে আমি মার্ডারার। আমি একজন অসমিয়াকে হত্যা করেছি।

—সে কি !

—বলেন কি ?

—আমি খুব অবাক হচ্ছি না। 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে মানুষ আর মানুষ নেই। শুধু যে বাঙালী মরছে তাও তো নয়। সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন নির্বিচারে মানুষ মানুষকে হত্যা করে।

—আপনি হয়তো এমনিভাবেই কোন অসমিয়াকে হত্যা করেছেন, তাতে আর লজ্জার কি আছে স্যার ?

—না। হিংসায় যখন পৃথিবী উন্মত্ত হয় তখন যে হত্যা হয়, যে হত্যা আমি করেছি সেটা তা নয়। আমি হত্যা করেছি টাকার লোভে।

—এ তুমি কি বলছো ডাক্তার ?

—হ্যাঁ, প্রফেসর! এক অসমিয়া কোটিপতি, একটিমাত্র তার সন্তান, পুত্র সন্তান। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান এক যুবক। হঠাৎ একদিন আকস্মিক এক দুর্ঘটনা হলো তার। সেই মুহূর্তেই অপারেশন প্রয়োজন। অপারেশন করতে বাড়ী থেকে বেরুবো এমন সময় এসে উপস্থিত ছেলেটির কাকা, আমার সামনে সুটকেশ খুলে সাজিয়ে রাখলো দশ হাজার টাকার নোট। বললে নিন। আরও বিশ হাজাব দেবো আজ অপারেশন টেবিলেই যদি ছেলেটি মারা যায়।

—আপনি নিলেন?

—এ টাকা আপনি নিলেন?

—না। টাকার যদিও ছিলো যথেষ্ট প্রয়োজন তবু টাকা আমি নিলাম না। টেলিফোনে পুলিশ ডাকবো ভয় দেখালাম। টাকা নিয়ে লোকটি গেলো পালিয়ে।

—আপনাব পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক স্যাব।

—কিন্তু অস্বাভাবিক হয়ে পড়লান আমি সেই মুহূর্ত থেকে। অপাবেশন কবতে চললাম, যেতে যেতে কেবলই মনে হতে লাগলো আমাদেব হাতে কতো লোকই তো মারা যায়। প্রাণপণ চেষ্টা কবেও তো কত রোগীকে বাঁচাতে পাবিনা। চিকিৎসাতেও হয ভুল। অপারেশনেব কাজেও হয ত্রুটি। সকল সতর্কতা সত্বেও। টাকাটা বড়ো বেশী ছিলো প্রযোজন। কাবণ আমাব যত্র আয তত্র ব্যয। আজ পর্যন্ত নিজের একটা বাড়ী কবতে পাবিনি আমি। অপারেশন থিয়েটাবে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম আমাব তখনকাব মনেব অবস্থা: টাকাটা না নিয়ে আমি জীবনেব চবম ভুলটিই কবেছি। অপাবেশন হলো। অপাবেশন টেবিলেই ছেলেটি গেল মাবা। কিন্তু সেই রাত্রে একমাত্র ঈশ্ববই হয়তো দেখেছিলেন যে গলাধাক্কা খেতে খেতে আমি বেবিযে এসেছি বোগীব কাকাব বাড়ী থেকে। কি, কেউ কোন কথা কইছো না যে?

[নিস্তব্ধতা]

সেইদিন থেকে আমাব কেবলই মনে হচ্ছিল—প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমি খুনী। কিন্তু আমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি এই যে আমাব শাস্তি

হবে না—কারণ আমার অপরাধ কেউ জানলো না। সব চেয়ে অসহ্য হলো কখন জানো ?

—বলুন।

—এক রাত্রে আমি আমার স্ত্রীকে সব বললাম। স্ত্রী তাতে কী বললেন জানো ?

—কি বললেন ?

—বললেন, তুমি একটি মূর্খ! তখন কেন নাওনি টাকাটা ? আমি পাগল হবাব আগে টাকাব শোকে তিনিই হয়ে গেলেন পাগল। আমাকে দেখলেই তিনি চেঁচিয়ে উঠতে সুরু কবলেন—কেন নাওনি টাকাটা ? শেষে দশজনেব সামনেও চীৎকাব কবতে লাগলেন ঃ—কেন নাওনি টাকাটা ? লোকজন প্রশ্নটা বুঝতে না পেবে হকচকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো ব্যাপাব কি ? তখন উপায়ান্তব না দেখে আমি ভেবে দেখলাম আমাকে পালাতে হবে। পালাতেই হবে। আর তাব সুযোগ পেয়ে গেলাম এই 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে।

—তুমিও তবে প্রাণ ভয়ে পালাওনি ডাক্তাব।

[নিস্তব্ধতা]

—কিন্তু আমি যে কি ভয়ে পালিয়েছি বুঝে উঠতে পারছি না।

—আপনি তো স্কুল মাষ্টাব।

—হ্যাঁ, আমি স্কুলমাষ্টাব। পঁয়ত্রিশ টাকায় ঢুকেছিলাম, দশ বছরে এখন বেতন দাঁড়িয়েছে একশো। যখন চাকবীতে ঢুকি তখনই সংসার সুখের আশায় বিয়ে কবেছিলাম একটি অসমিয়া তরুণী। প্রেমেব প্রাবল্যে এই দশ বৎসবে আমবা জন্ম দিয়েছিলাম সাতটি সন্তান। একথা জেনে-শুনেও যে মাসিক আয় কিন্তু আমাব একশো টাকাব বেশী নয় কখনো। মাঝে মাঝে মনে হ'তো এসব কি হচ্ছে! স্ত্রী বল্‌তেন জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। কিন্তু তা তিনি দিলেন না। ফলে চোখেব উপর দেখতে পাচ্ছিলাম ছেলেপুলেগুলো হয়ে দাঁড়াচ্ছে চোব জোচ্চব। আর বড়ো মেয়েটার মতিগতিও যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছিল।

—হতেই হবে।

—আমি তো বলি গরীবের বিয়ে করাই উচিত নয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু গরীবেরই ঘোড়া রোগ হয় জানেন তো? আমারও হয়েছিলো তাই। সংসারের অবস্থা দেখে কেবলই মনে হতো এখন মবলে বাঁচি। তা' এমন বরাত! কলেরা থেকেও একবার বেঁচে উঠলাম। তখন ভাবলাম পালিয়ে যাবো। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে যাবো বনে কিংবা পাহাড়ে। সুযোগ খুঁজছিলাম। এমন সময় সুরু হলো এই 'বংগাল খেদা আন্দোলন' আর এ আন্দোলনের এমনই প্রকোপ যে আমার অসমিয়া পত্নী গর্ভজাত সন্তান বাহিনী লাঠি সোটা হাতে নিয়ে তেড়ে এলো আমাকে মারতে। প্রাণটা রক্ষা পেলো অবশ্য ঐ অসমিয়া পত্নীরই উদার করুণায়।

—আশ্চর্য!

—হাঁ, আশ্চর্য! বললেন তিনি: 'বংগাল হলেও পতি বটে।'

—বৈধব্যেব হাত থেকে বক্ষা পেতেই তিনি আপনাকে রক্ষা কবে থাকবেন।

—হয়তো তাই। কিন্ত ঐ এম, এ, পাশ প্রফেসারেব যে শক্তি ছিলো না—ম্যাট্রিক ফেল পণ্ডিতটিব সে শক্তি পুবোপুরি ছিলো। আর আমাব জয়মতীর ছিল মাতৃত্বেব অনন্ত ক্ষুধা।

—তবে মশাই আপনি পালালেন কেন?

—পালালাম শুধু এই জন্যে যে ঐ প্রফেসাবেব আর্থিক শক্তির দশ ভাগের এক ভাগও আমার নেই। ছেলেপুলেগুলোকে ভাতকাপড় দিয়ে পুষতে পারছিলাম না। চোখেব উপব দেখতে পাচ্ছিলাম তাবা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। কেবলই মনে হতে লাগলো অপবাধটা ওদেব নয়, অপবাধ আমার। পালাবাব সুযোগই আমি খুঁজছিলাম। সে সুযোগ পেয়ে গেলাম এই মোটর বাসে।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

—কী এক আশ্চর্য পরিবেশ এখানে সৃষ্টি হয়েছে যে মনে হচ্ছে কেউ যেন সাঁড়াশী দিয়ে মুখ থেকে টেনে বের কবছে মনের গোপনতম কথাটি।

—আপনি যখন একজন নেতা—এটা খুবই স্বাভাবিক, আপনার মনে এক মুখে এক হবেই। তাতেই না আপনার এই বিপদ।

—কিন্তু মনে এব মুখে এক না হলে নেতাই হতে পারতেন না উনি। কেউ পারে না।

—রাজনীতি মানেই, মনে এক মুখে এক।

—শুধু নেতা কেন যে-কোন সভ্য মানুষেরই সেই কথা। মনের কথা গোপন করবার জন্যেই ভাষার হয়েছে সৃষ্টি।

—যে ভাষার এ ক্ষমতাটা যত বেশী সে ভাষা ততো সমৃদ্ধ! সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের বাংলা ভাষা এখন বেশ চালাক হয়ে গেছে।

—অসমিয়ারা ভাষায় এই মারপ্যাচ হয়তো পছন্দ করে না বলেই বোধ হয় বাংলা ভাষাটাকে আসাম থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে।

—ও সব বাজে কথা রাখুন। 'বংগাল খেদা' আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ। হ্যাঁ, আমার পকেটেই তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পত্র রয়েছে।

—এত প্রমাণ থাকতেও তবু আপনি আমাদের সঙ্গে পালাচ্ছিলেন কেন মশাই? বিশেষ আপনি যখন নেতা।

—পালাতে গেলেও নেতার দরকাব হয়।

—আমি আমার শেষ মিটিংয়েই স্পষ্টভাবে বলে এসেছি কেন আমি পালাচ্ছি।

—আপনার সেই মিটিংয়ে আমবা ছিলাম না।

—আমি ছিলাম। উনি বলেছিলেন অসমিয়াদেব রাজনৈতিক চক্রান্তে অনসমিয়ারা আসামে মাইনরিটিতে পরিণত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আসামে আন্দোলন করে কোন ফল হবে না। আন্দোলন করতে হবে সেখানে যেখানে বাঙালীরা মেজরিটি। আন্দোলন করতে হবে কলকাতায়। আর আন্দোলন করতে হবে রাজধানী দিল্লীতে।

—কথাটা উনি নেহাৎ মিথ্যে বলেননি!

—হ্যাঁ, সে মিটিংয়েও আমি দেখছি সকলেই সমর্থন করলেন

আমাদের এই নেতাকে। বিপুল জয়ধ্বনির সঙ্গে। ওঁকে এরোপ্লেনে কলকাতা—দিল্লী পাঠাবার খরচও তুলে দেওয়া হয়েছিল ওঁর হাতে সেই মিটিংয়েই। কিন্তু এটা আমি বুঝছি না, এরোপ্লেনে না গিয়ে এই বিপজ্জনক পথে মোটর বাসে কেন উনি এলেন।

—সত্যি কথা গোপন করবার শক্তি আর আমার নেই। শুনুন তবে আপনারা। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম, আসামে বাংলা ভাষার উৎসাদন রোধ করতে হবে বাঙ্গালী সমাজকে একতাবদ্ধ করে—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বারা। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে—জননী এবং জন্মভূমিব সম্মান রক্ষা করতে সন্তানকে জীবন দানও করতে হয়। কর্তব্যের এই চেতনাটি আমার ছিল, কিন্তু কার্যকালে জীবন বিপন্ন করার সাহস পেলাম না আমি। অথচ নেতৃত্ব হারাতেও আমি ছিলাম অনিচ্ছুক। তাই সংঘর্য যখন হয়ে দাঁড়ালো অবশ্যম্ভাবী কলকাতায় গিয়ে আন্দোলন চালাবার ছলনার শরণ গ্রহণ করতে হলো আমাকে। বাঙালী সমাজ আমার এই প্রচেষ্টা সমর্থন করল—এবোপ্লেনে কলকাতা আর দিল্লী যাবার খরচও পেয়ে গেলাম হাতে হাতে। কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগলো, না, আত্মপ্রবঞ্চনা আর নয়। আমি যেন তখন পালাতে পারলেই বাঁচি।

—কিন্তু আমরা বেঁচেছি কি ?

—ড্রাইভার ? তুমি তোমার গাড়ীটাব খোঁজ পেয়েছো কি ?

—গাড়ী তো দূরের কথা—আমরা কোথায় তাই কি বুঝতে পারছি আমরা ?

—ঐ কারা যেন আসছে।

—হ্যাঁ, কারা যেন এদিকে আসছে।

—বাঁচা গেলো। ওরাই বলতে পারবে আমরা কোথায় !

[দু'তিনজন লোকের প্রবেশ]

প্রথম লোক॥ অতো বড়ো মোটর বাসটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে।

—কোথায় মশাই ? কোথায় ?

দ্বিতীয় লোক ॥ গাড়ীটা যখন খাদে পড়ে গেছে তখন চুরমার হবে না তো কি ?

—বলেন কি মশাই ? আর গাড়ীর ভিতরে যারা ছিলো তারা ?

তৃতীয় লোক ॥ বাসটা চুরমার হয়েছে তো কি হয়েছে ! সার্ভিসের গাড়ী ইনসিওর করা ছিলো নিশ্চয় ।

—না না, আমার এ গাড়ী সার্ভিসের নয় । এ আমার নিজের গাড়ী । বলুন না মশাই গাড়ীটা কোথায় ?

প্রথম লোক ॥ সিগ্রেট আছে ?

দ্বিতীয় লোক ॥ সিগ্রেট আছে কিন্তু দেশলাই নেই !

—দেশলাই, আমার কাছে আছে । আমার কাছে আছে ।

প্রথম লোক ॥ তোমবাও যেমন, একঠা দেশলাই সঙ্গে রাখতে পারো না ।

—আপনারা কারা মশাই ? আপনারা কি আমাদেব কথা শুনতে পাচ্ছেন না ?

দ্বিতীয় লোক । চাবদিকে সব চুপচাপ । কেউ যে কোথাও আছে মনে হচ্ছে না । আর কতো খোঁজা খুজি কববো । যে দৃশ্য দেখলাম তাতে হাত পা আব সবছে না ।

—এবা বলছে কি ? আমবা এতো চীৎকার করছি, তাও বলছে চারদিকে সব চুপচাপ ?

তৃতীয় লোক ॥ জায়গাটা বেশ নির্জন । এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্ ।

—নির্জন ! জায়গাটা নির্জন ! আমরা এতগুলো লোক থাকতে ? এরা বলছে কি ?

—ও মশাইরা, আপনারা কি আমাদেব দেখতে পাচ্ছেন না ?

প্রথম ॥ এখন সবচেয়ে বড়ো কথা, এতগুলো লোকের সংকারের কি ব্যবস্থা করা হবে ?

দ্বিতীয় ॥ সে ভাবনা তোমার কেন ? আমরা সহরে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েই খালাস ।

—সংকার হবে ? কাদের সংকার হবে মশাই ?

তৃতীয় ॥ আমি ভাবছি লোকগুলো মোটরের পেট্রলের আগুনে যেভাবে ঝলসে গেছে সনাক্ত করতে পারবে না কেউ, ওবা কে।

দ্বিতীয় ॥ তা বটে।

—আপনারা বলছেন কি ? ও মশাই, আপনারা বলছেন কি ?

প্রথম ॥ আমবা রিপোর্ট দিয়েই খালাস। "একটি পলায়নপর যাত্রীবাহী বাস পাহাড়ী পথের খাদে পড়িয়া চুবমার হইয়া গিয়াছে।"

—আমবা কি তবে বেঁচে নেই ?

—য়্যা ! আমবা কি তবে বেঁচে নেই ?

তৃতীয় ॥ আশ্চর্য ! একটি আবোহীও বাঁচেনি। আব এমন শোচনীয় মৃত্যু বড়ো একটা দেখা যায় না।

[মোটরবাহিত লোকগুলি একসংগে আর্তনাদ কবিযা উঠিল]

দ্বিতীয় ॥ (হাসিয়া) একটা কথা স্পষ্ট হলো আজ—যে পালালেই বাঁচা যায় না। চলো।

[মৃত ব্যক্তিদেব অব্যক্ত যন্ত্রণাব মধ্যে যবনিকা নামিল]

উত্তবা
শাবদীযা সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

ভূভারহরণ কর্পোরেশন

শেষ রাত্রে ভূভারহরণ কর্পোরেশনের আপিস ঘরে প্রবেশ করলেন উক্ত করপোরেশনের সভাপতি শ্রীমৎ হর্য্যানন্দ এবং তৎপশ্চাতে অর্দ্ধ-নগ্ন-ফকির-প্রায়-বেশ ক্যাবলা।

হর্য্যানন্দ॥ জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দ-নন্দন! রাজা কর বাবা! [আফিস ঘরে রক্ষিত ও পূজিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিকে প্রণাম করে, ক্যাবলাকে—] এসো, এসো বাবা, ব'সো। [ক্যাব্‌লা কুণ্ঠিতভাবে উপবেশন করলে—] তাই বলছিলাম কি—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

তোমাকে দেখলাম অন্ধকারে পথ খুঁজে মরছ। কিন্তু পথতো পড়ে রয়েছে। সোজা সরল পথ। ওরে মোহবদ্ধ জীব! কেন বৃথা আঁধারে ঘুরছিস। আঁধারে আঁধারে আর কতকাল কাটাবি!

ক্যাবলা॥ আজ্ঞে আজ ঠাকুরকে যখন একবার ধরতে পেরেছি, আর তো ভাবছি না কর্ত্তা! সাধে কি আর পিছু নিয়েছি! তরাতে আমাকে হবেই বাবাঠাকুর! জ্বালা · জ্বালা · · · এ বুকে বড় জ্বালা। [ক্রন্দনোপক্রম]

হর্য্যানন্দ॥ কাঁদিস নে রে, কাঁদিস নে · · সম্মুখে তোর ভূভারহরণ শ্রীনন্দ-নন্দন। তবু কাঁদবি। বল ব্যাটা,তোর কাহিনী বল। তোর সকল শোক—সকল পাপ ঐ সচ্চিদানন্দের পায়ে ব্যক্ত কর। দেখবি কি শান্তি। বুক ভরে উঠবে রে, শান্তিতে তোর বুক ভরে উঠবে! বল ব্যাটা, ঐ অন্ধকারে, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে, কি করছিলি· · · · কি ভাবছিলি?

ক্যাবলা ॥ তোমারি পিছু নিয়েছিলাম ঠাকুর, তোমারি পিছু নিয়েছিলাম। আজ দুদিন পেটে অন্ন নাই, ভাবলাম ঠাকুরের পিছু নি, দুটো প্রসাদ মিলবে।

হর্য্যানন্দ ॥ হুঁ। তারপর?

ক্যাবলা ॥ বড় আশা করে ঐ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ঠাকুরের পিছু পিছু চললাম·········

হর্য্যানন্দ ॥ কি করে? ঐ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে কি করে আমায় দেখছিলি?

ক্যাবলা ॥ ঠাকুরের জ্যোতি—সে তো আর এই ক্যাবলার কাছে লুকোতে পারবে না কর্ত্তা! পিছে পিছে কুত্তার মতো চললাম! মনে মনে ভাবতে ভাবতে চললাম রাজভোগ—আজ রাজভোগ প্রসাদ কপালে নাচছে! আজ আমাকে পায় কে! কতবার যে হোঁচট খেলাম তাকি গ্রাহ্যি করলাম! কিন্তু প্রভু, তোমার যে কি ইচ্ছা, ঐ হোঁচট খাওয়াই আমার সার হল!

হর্য্যানন্দ ॥ কেনরে ব্যাটা, এ কথা বলছিস কেন! জগতে কোনটা যে সার আর কোনটা যে অসার তা বিচাব কববার মালিক কি তুই আর আমি! ঐ যে হোঁচট খেয়েছিস, ওরও দাম আছেরে ভাই, দাম আছে। 'হাঁটিতে শেখেনা কেহ না খেলে হ্যাছাড়' সাধনমার্গেও ঐ কথারে ব্যাটা ঐ কথা। হুঁ, তারপর?

ক্যাবলা ॥ তারপব আর কি! কিছু না! আমাব পোড়া কপালে হাত বুলোতে লাগলাম!

হর্য্যানন্দ ॥ কতটা দেখলি? বলনা, শুনি। তাব তো বুঝব পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে কতটা এগিয়ে গিয়েছিস!

ক্যাবলা ॥ আজ্ঞে কর্ত্তা, তাবপর যা দেখলাম সেটা স্বচক্ষে দেখলাম কি স্বপ্ন দেখলাম এখনো বুঝে উঠতে পারছি না।

হর্য্যানন্দ ॥ [মৃদুহাস্যে] দেবো—দেবো, সবই বুঝিয়ে দেব। তোর কি মনে হল বল দেখি।

ক্যাবলা ॥ অজ্ঞে প্রভু, এক গ্লাস জল পাই কি?

হর্য্যানন্দ ॥ ওরে বাবা রাখোহরি! দু কাপ চা-ভোগ দিয়ে যা বাবা।

ক্যাবলা ॥ সঙ্গে গোটাকয়েক রাজভোগও দিতে বলো ঠাকুর। আজ দুদিন পেটে অন্ন নাই।

হর্য্যানন্দ ॥ আরে ব্যাটা, ভাবছিস কেন! একবার যখন শ্রীনন্দনন্দনের পায়ে এসে পড়েছিস, এখনো পেটের ভাবনা ভাবছিস! ওরে উনি যে ভুভারহরণ করেন! এখনো তুই পেটের ভাবনা ভাবছিস?··· বল ব্যাটা, তারপর কি দেখলি! বুঝতে দে···কতটা তুই এগিয়ে আছিস!

ক্যাবলা ॥ গলির শেষে মস্ত তেতালা বাড়ী। বাড়ীটা জানতাম, মল্লিকদের। মনে ভাবলাম ঠাকুর এইবার বুঝি দারোয়ানকে ডাকবেন। আমি একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমি অবাক! ঠাকুর তো দারোয়ানকে ডাকলেন না!

হর্য্যানন্দ ॥ [মৃদুহেসে] ডাকলাম না তো! ওরে, ডাকলেই কি ও শুনতো! মায়াচ্ছন্ন জীব! ওর যে এখনো সময় হয়নি! এখনো যে ওর—অনেক বাকী। তাই, ওকে ডেকে কোন ফল নেই। তাই, ডাকলাম না!

ক্যাবলা ॥ তারপর যা দেখলাম·········[থেমে গেল।]

হর্য্যানন্দ ॥ [মৃদুহেসে] বল্—বল্। থামলি কেন?

ক্যাবলা ॥ এখনো বুঝছি না ঠাকুর সে আমার কি! স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম!

হর্য্যানন্দ ॥ ওরে ব্যাটা, কথাবার্ত্তায় দেখছি অনেকটা এগিয়েছিস! কতটা দেখলি—কি দেখলি—বল্।······জ্ঞানাঞ্জন শলাকা রে, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। তিনি যখন জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে জীবের চক্ষুরুন্মীলন করে দেন, তখন ভৌতিক আধিভৌতিক সব কিছু দেখা যায়—সব কিছুর মানে হয় ·····বল ব্যাটা, তারপর কি দেখলি!

ক্যাবলা ॥ কিন্তু গলা আমার শুকিয়ে আসছে। চা-ভোগের আর কত দেরী!

হর্য্যানন্দ ॥ আরে ব্যাটা, গাছের ফল। যখন পাকবে—আপনা থেকেই টুপ্ করে পড়ে যাবে। তার আগে তুই পেড়ে খা, রসের ব্যত্যয়

হবে। চায়ের জল এখনো ফোটেনি নিশ্চয়। ফুটতে দেরে, ফুট্‌তে দে। বল্‌ ব্যাটা, তারপর কি দেখলি ?

ক্যাবলা॥ দারোয়ানকে না ডেকে, তুমি ঠাকুর, অবলীলাক্রমে—

হর্য্যানন্দ॥ অবলীলাক্রমে! ব্যাটা দেখছি শব্দের দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে আছিস, কেবল ব্রহ্মের সঙ্গেই সাক্ষাৎ নেই। তা হবে—হবে—এখানে আসতে একবার যখন পথ পেয়েছিস, ও শব্দও হবে, ব্রহ্মও হবে। হুঁ, অবলীলাক্রমে— ?

ক্যাবলা॥ তুমি ঠাকুর দেওয়ালটি টপকালে।······দেখাদেখি, আমিও—

হর্য্যানন্দ॥ অবলীলাক্রমে ?

ক্যাবলা॥ না। তা আর পারলাম কই! তা কি আর পারি! তুমি কে! আমি কে! তবে হ্যাঁ, তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে, নানা কসরৎ করে, অনেক উত্থান পতনের পর তোমারি পায়ের ধূলোর জোরে, শেষে এই পঙ্গু যখন গিরি লঙ্ঘন করল, তখন ঠাকুর আমার, পাইপ বেয়ে মল্লিকদের দোতলার গাড়ী বারান্দায় উঠে······

হর্য্যানন্দ॥ বা ব্যাটা বা! জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন! [মূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে, হঠাৎ ক্যাবলাকে] ঠাকুরের কৃপা পেয়েছিস। অনেক কিছু দেখেছিস। ভূভারহরণ রে, ভূভারহরণ! তারপর—তারপর ?

ক্যাবলা॥ হঠাৎ একটা সোরগোল শুনলাম। দোতালার কোন ঘরে।

হর্য্যানন্দ॥ "চোর! চোর!" এমনি কোন শব্দে দিগ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হল, কেমন ? [মৃদু মৃদু হাস্য]

ক্যাবলা॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ভারী ভয় হল! গা কাঁপতে লাগল।

হর্য্যানন্দ॥ গা কাঁপতে লাগল! তোর গা কাঁপতে লাগল! "চোর! চোর!" শব্দ শুনে·········কে রে তুই ? গোকুলে গভীর রাতে ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন যখন ঘরে ঘরে দুগ্ধ সর ননী চুরি কর্ত্তেন অমনি "চোর চোর" রবে দিগ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হত—আর সঙ্গে সঙ্গে —সঙ্গে সঙ্গে গোপিনীদের গা কাঁপতো—সে গা কাঁপার মানেটা

কি ? উদ্দীপন হ'তো। উদ্দীপন……কে রে তুই, তোর গা কাঁপতে লাগল ?

ক্যাবলা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কি করব ভাবছি, এমন সময় দেখলাম প্রভু পাইপ বেয়ে তরতর করে নেমে আসচেন। লোকজন তাড়া করেছে। আমি দেখলাম প্রভুর পথই আমার পথ। আমার আর দেরী করা উচিত নয়। কারণ প্রভু যা অবলীলাক্রমে সারবেন, আমার কপালে সেখানে অনেক উত্থান অনেক পতন লেখা রয়েছে—কাজেই আগেভাগেই আমি ছুটলাম, কিন্তু দেওয়াল টপকাতে গিয়ে—

হর্য্যানন্দ ॥ সেও ঠাকুরের ইচ্ছা। দেখলাম উবু হয়ে তুই পড়ে রয়েছিস—বুঝলাম তখন তোর পতন-যোগ। আমার সাধনমার্গে তখন তুইই আমার সোপান হলি।

ক্যাবলা ॥ তখন…… তখন প্রভু, লোকজন সব চেঁচাচ্ছে "চোর চোর ·· সিন্ধুক ভেঙ্গেছে, গয়না নিয়েছে·· ধর ধর ……" আমার পা কাঁপতে লাগল, থবথব কবে পা টলছে, মাথা ঘুরছে—

হর্য্যানন্দ ॥ উদ্দীপন—তখন তোর জোব উদ্দীপন, বুঝলিরে ব্যাটা ? তাবপর ? তাবপব ?

ক্যাবলা ॥ তারপব আর কি ! দেখলাম প্রভুব শ্রীচরণ ছাড়া গতি নেই। বাঁচবার আর কোন পথ নেই। প্রভুব এক পা তখনো এদিকে ছিল—ধরে ফেললাম—তুহাত দিয়েজড়িয়ে ধরলাম ! প্রভুর আকর্ষণ হ'ল, বেঁচে গেলাম !

হর্য্যানন্দ ॥ তাহলে বুঝেছিস ! ভুভারহবণরহস্য কতকটা বুঝেছিস ! হ্যাঁ, বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছিস।

ক্যাবলা ॥ অগ্রসর হয়েছি ! কোথায় প্রভু ?

হর্য্যানন্দ ॥ ব্যাটা ক্যাবলা আরকি ! সাধনপথে। আলোতে এসে তোর চেহারাটা দেখেই আমি ধরতে পেরেছিলাম। এদ্দিন কোথায় কি প্রক্রিয়ায় সাধনভজন করেছিস বল্ দেখি—

ক্যাবলা ॥ দাঁড়ান প্রভু, আগে গলাটা ভিজিয়ে নি। এই যে বাবা

রাখোহরি, আনো—আনো—এদিকে আনো! একি! এযে দেখছি শ্রীনন্দনন্দনের বাল্যভোগ! দুগ্ধসর ও চাঁছি! [চায়ে চুমুক দিয়া] আ—……আমার গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে ঠাকুব, একটা ভজন গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে ··

"হরিব কৃপায় দশজনে খায়
আমবাই কেন খাবো না!"

হর্য্যানন্দ॥ ওরে কে তুই! অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিস! এতকাল কোথায় ছিলি বে?

ক্যাবলা॥ এখানে—ওখানে—সেখানে—পথে পথে—অপথে বিপথে—সর্ব্বত্র প্রভু, সর্ব্বত্র!

হর্য্যানন্দ॥ লৌকিক পাসটাস কিছু দিয়েছিলি?

ক্যাবলা॥ তা "বি-এল্" নদী পাব হয়েছিলাম বই কি প্রভু! ··আপনি প্রভু আপনি?

হর্য্যানন্দ॥ তা যদি বলিস, তবে সে তো অনেক দূবই এগিয়ে গিয়েছিলাম। ইকনমিক্সে "এম-এ", বুঝেছিস? কিন্তু তাতে ভবার্ণব তো তবতে পাবলাম না! নাক নি চুবানি খেতে খেতে, যখন প্রাণ-পাখী খাঁচাছাড়া হয—হয়—, তখন—তখন মনে হল ভূভাবহবণ শ্রীনন্দনন্দনকে ভুলেই না জাবেব এই দুর্গতি!

ক্যাবলা॥ তারপবই বুঝি এই ভূভাবহবণ কবপোবেশন?

হর্য্যানন্দ॥ তোমার অনুমান যথার্থ বৎস!

ক্যাবলা॥ এ করপোবেশনেব সভ্য সংখ্যা এখন কত প্রভু?

হর্য্যানন্দ॥ [মৃদু হাস্যে] সংখ্যাতীত! অব্যক্ত! অব্যয়। কি বকম জানো? বেল কম্পানীর বিজ্ঞাপন দেখনি? Thieves and swindlers are about : beware. মানে, কে যে, জানবার উপায় নাই। কে যে নয় বলা যায় না।

ক্যাবলা॥ লোক পবম্পরায় এসব খবব পেয়েছিলাম প্রভু, কিন্তু ঠিক ধরতে পারি নি। "ভূভারহবণ করপোবেশন!" চমৎকার নাম! মুদ্রিত নিয়মাবলীটটি দেখতে পাই কি?

হর্য্যানন্দ ॥ না—না। ওসবের বালাই আমাদের নাই। শ্রীনন্দনন্দনের ব্রজলীলা কে না জানো বাবা? সেই পরমলীলাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র শাস্ত্র—একমাত্র গাইড। শ্রীনন্দনন্দন দুগ্ধ সর ননী চুরি করে খেতেন, আহা! গোপিনীর মন চুরি করতেন—

ক্যাবলা ॥ আহা!

হর্য্যানন্দ ॥ রুক্মিণীহরণ তিনিই করেছেন, ভূভারহরণও তিনিই করেছেন! ওরে বৎস, তলিয়ে দেখ · তলিয়ে দেখ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, law of gravitation, balance of power, foreign exchange, socialism, socialism কেন, তোমাদের last word, communism পর্য্যন্ত··· ··সব কিছু সবকিছুর পথ প্রদর্শকই তিনি। জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন!

ক্যাবলা ॥ জয় শ্রীভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দন! কিন্তু এক কথায় ঐ "হরি" নামটিই বেশ!

হর্য্যানন্দ ॥ আরে, "হরিই"তো হচ্ছেন আমাদের creed! ওটা হচ্ছে বীজমন্ত্র, বুঝেছিস? "হরি" কিনা হরণ করি, অপহরণ করি! কথাগুলো শুনতেই খারাপ কিন্তু কত গুরুত্বপূর্ণ সব theory ওতে যে অন্তর্নিহিত রয়েছে. কজনে তা তলিয়ে দেখছে! অসাম্যে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে। হরণ কর, সাম্য আসবে। Equilibrium, adjustment, সোসিয়ালিজম তাই বা কেন, আজকের শেষকথা communism, প্রত্যেকটির বীজ রয়েছে "হরি" এই বীজমন্ত্রে! এই যে আজ মল্লিকদের বাড়ীতে হরণ হ'ল, এতে সমাজের ভালো হ'ল কি মন্দ হল একবার বিচার করে দেখ।

ক্যাবলা ॥ সমাজের কথা ছেড়ে দিন প্রভু। এ সব তত্ত্বকথা আজকালকার সমাজে অচল। এসব হচ্ছে বিশ্বাসের কথা, কেউ করে, কেউ করে না।

হর্যানন্দ ॥ বুঝিয়ে দিলে কেন বিশ্বাস করবে না বৎস!

ক্যাবলা ॥ ধরুন আমি কংসানুচর পুলিসের কথাই বলছি। তারা তো আর এসব বুঝবে না। বিবেচনা করুন তারা যদি আমাদের

অনুসরণ করতে থাকে, বিবেচনা করুন তারা যদি এই গুপ্ত বৃন্দাবনের সন্ধানও —পেয়ে থাকে, বিবেচনা করুন—

হর্য্যানন্দ ॥ সে সব বিবেচনা করাই আছে। আরে মল্লিকদের মাল কি আর এখানে আছে! সে এতক্ষণ মল্লিকা হয়ে কোন কুঞ্জ আলো করছে, সে শুধু ঐ 'রাখোহরি'ই জানে!

ক্যাবলা ॥ এর মধ্যে পার করেছেন?

হর্য্যানন্দ ॥ আমি কি আর পার করেছি বাবা, সে আমার ঐ 'রাখোহরি' বাবাই পার করেছে!

ক্যাবলা ॥ কখন? কখন প্রভু?

হর্য্যানন্দ ॥ ঐতো বাবা একপেয়ালা চা আর একটু দুগ্ধ সর চাঁছি দেখে মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়লে! আমার 'রাখোহরি'কে চিনলে না! আমি তো শুধু এম-এ, উনি হচ্ছেন এম-এ, বি-এল! তোমায় চাভোগ দিয়ে আমার পাগড়িটি যে তুলে নিয়ে গেলেন·· চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সেটি তো আর দেখলে না!

ক্যাবলা ॥ বলেন কি প্রভু! আমার কপালে কি শুধুই তবে ঐ দুগ্ধসর ও চাঁছি! সদ্য-আহৃত মহাপ্রসাদের কণিকাও কি আমি পাবনা নিঠুর ঠাকুর?

হর্য্যানন্দ ॥ করপোরেশনের মেম্বর তো এখনো হওনি বাবা!

ক্যাবলা ॥ হচ্ছি! এখনি!

হর্য্যানন্দ ॥ না বাবা। এখনো সময় হয় নি। সাধনা এগিয়েছে বটে, কিন্তু শেষ হয় নি। হাঁকুপাঁকু করো না বৎস। ভেতরের আমটাকে পাকতে দাও, নইলে যে রসের ব্যত্যয় হবে বাবা।

ক্যাবলা ॥ বাবা! আমায় ক্ষমা করুন। 'রাখোহরি' বাবার কি আর দর্শন পাবনা প্রভু?

হর্য্যানন্দ ॥ না বৎস। আজ রাত্রে আর না।

ক্যাবলা ॥ কিন্তু তাঁকে আর একটি বার না দেখে আমি তো যেতে পারবো না প্রভু! অমন রতন পেয়েও আমি চিনলাম না! কোথায় গেলেন তিনি প্রভু?

হর্ষ্যানন্দ ।। তবে তোমায় তত্ত্বকথা বলি শোন। তুমি তো বি-এ পাস দিয়েছ। ইকনমিকস্ যে একেবারে না বুঝবে তা তো নয়—

ক্যাবলা ।। বলুন—বলুন, বি-এতে ইকনমিক্সে আমি অনার্স নিয়েছিলাম।

হর্ষানন্দ ।। ব্যাস, তবে ইকনমিক্সের ভাষাতেই বলি। এই যে মল্লিকদের বাড়ীতে হরণ হল, জানো এই মল্লিকদের ?

ক্যাবলা ।। আজ্ঞে তা আর জানবো না! ব্যাটারা তো টাকার কুমীর, কলকাতায় কে না জানে!

হর্ষ্যানন্দ ।। বনেদি ঘর। বসে বসে খাচ্ছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। টাকায় স্যাওলা পড়ছে—এত টাকা এক যায়গায় জমে গেছে! ইকনমিক্সের ভাষায় এতগুলো টাকা এক যায়গায় একেবারে 'জমাট' হয়ে 'অচল' হয়ে পড়ে রয়েছে!

ক্যাবলা ।। অর্থ্যাৎ টাকা আছে কিন্তু তার circulation বন্ধ হয়ে রয়েছে!

হর্ষ্যানন্দ ।। এই তো বুঝছ! সমাজের পক্ষে, দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে এ যে কী ক্ষতিকর পরিস্থিতি বোঝ বাবা বোঝ। ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দনের আসন টলে উঠল। তার ইঙ্গিতে হরণ করলাম মল্লিকের পাঁচ হাজার টাকার গয়না। তখনি চালান দিলাম তা 'রাখোহরি' বাবার হাতে। ছুটলেন 'রাখোহরি' বাবা 'বলহরি' ঠাকুরের আড্ডায়!

ক্যাবলা ।। 'বলহরি' ঠাকুর! সে আবার কে বাবা ?

হর্ষ্যানন্দ ।। মহাপুরুষ। অক্রূর, কলিযুগের অক্রূর! যোগাযোগ রক্ষা করেন। 'হরির লুট' সব তাঁর ওখানে গিয়েই জড়ো হয়। তিনি নাম-মূল্যে কিনে নেন। আবার তখনি প্রেমমূল্যে বিক্রি করেন। 'রাখোহরি' বাবা পাচ হাজার টাকার গয়না দু'হাজারে 'বলহরি' বাবাকে গছিয়ে······যেই এখানে আসবে, ভাগ হয়ে যাবে বাবা ভূভারহরণ করপোরেশনে! টাকা হাতে পেয়েই মেম্বাররা ছুটবে, যার মন যায় যেখানে। এক সূর্য্য ডুবে আর এক সূর্য্য উঠতে না উঠতেই দু' হাজার শেষ। মল্লিকদের ধন নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেল না। বন্‌বন্ করে হাতে হাতে ঘুরছে রে ভাই, হাতে

হাতে ছুটছে! দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এমনি করেই না তবে জেঁকে উঠবে!

ক্যাবলা ॥ বেচারা মল্লিক।

হর্য্যানন্দ ॥ না না, বেচারা তাঁকে বলো না ক্যাবলা। তাঁর এক পয়সাও ক্ষতি হল না বৎস! ও সব গয়নাই ইনসিওর করা ছিল। ও পাঁচ হাজার টাকাই তাঁর ঘরে ঘুরে আসবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানীরও যে ক্ষতি হল, তাই কি বলতে পার? এরকম: 'ক্লেম্' তাদের মেটাতে হবে ধরে নিয়েই না তারা ব্যবসা কচ্ছে! 'ক্লেম'টা তারা চট্ করে মিটিয়ে দিয়েছে যেই রটবে, অমনি আরো দশজন ছুটে আসবে, তাদের ধন-সম্পত্তি ইনসিওর কর্ত্তে! কার যে কোথায় লোকসান হচ্ছে ভেবেও পাবে না বৎস! এমনি আমার লীলা ভূভারহরণ ঐ শ্রীনন্দনন্দনের!

ক্যাবলা ॥ তাই তো দেখছি!

হর্য্যানন্দ ॥ ইকনমিক্সে কি বলে? টাকা যত চট্‌পট্ হাত-বেহাত হবে ব্যবসা-বাণিজ্য তত ফেঁপে উঠবে। তাই হচ্ছে কি না বল! মল্লিকরা চোর তাড়াবার জন্য দশজন দারোয়ানের যায়গায় বিশজন দারোয়ান রাখবেন। দশজন বেকারের অন্ন সংস্থান হবে। নতুন প্যাটার্ণের গড্‌রেজ' সিন্ধুক কিনবেন। 'গড্‌রেজের ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বাজারে মুলধন বেড়ে যাবে। বেশী টাকা খাটবে। কাজ বেড়ে যাবে! আর যদি—

ক্যাবলা ॥ আর যদি?

হর্য্যানন্দ ॥ ভূভারহরণ না হ'ত রে ভাই, ভূভার হরণ না হ'ত? কি হত ঐ পুলিসের? চাকরি থাকতো? কি হ'ত ঐ সব দারোয়ান প্রভুদের? কি হ'ত সিন্দুক কোম্পানীর? কি হ'ত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর? ভেবে দেখ্ বাবা ভেবে দেখ! ভার হরণ হচ্ছে বলেই না সমাজের একস্তর থেকে থেকে টাকার ক্রয়কারিণী শক্তি, যাকে তোমরা 'purchasing power' বল, সমাজের আর একস্তরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। প্রাচুর্য্যের ভার কমিয়ে

অভাবের বৈষম্য দূর হচ্ছে, সাম্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ইকনমিক্স তো পড়েছ, তুমিই বল 'velocity of circulation' বাড়ছে কি না 'business activity' বাড়ছে কিনা, 'marginal utility' যেখানে কম, সেখান থেকে, 'marignal utlity' যেখানে বেশী সেখানে টাকা যাচ্ছে কি না? বল ভাই বল, সমাজে র পক্ষে এটা মন্দ না ভালো? ক্ষতিটা কার হ'ল বল বাবা, বল—

ক্যাবলা॥ তা ঠিক বলতে পারব না, তবে ভূভারহরণ করপোরেশনের যে লাভ হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই প্রভু।

হর্য্যানন্দ॥ হ্যাঁ, হচ্ছে কিন্তু socityর লাভ হচ্ছে নাকি? এই সোসাইটি—যে সোসাইটিতে টাকা ছাড়া এক দণ্ড চলে না, ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া যে সোসাইটি একেবারেই সমৃদ্ধ হয় না, অর্থের সচলতার ওপরই যে সোসাইটির নির্ভর, বল বাবা ক্যাবলা সে সোসাইটিতে এই ভূভারহরণ করপোরেশন কি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন? অনাবশ্যক? যদি বল, আমরা কিছু উৎপাদন করি না— আমরা শুধু পরের উৎপাদিত ধন ভোগ করি, হাত-বেহাত করি, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, উকীলরা কি করে? ডাক্তাররা কি করে? পলিটিসিয়ানরা কি করে? কী ধন তারা উৎপাদন করে? সমাজের মাথায় যদি তাদের স্থান হয়, সমাজের এক কোণে কি আমাদের এতটুকু স্থান হতে পারে না?

ক্যাবলা॥ প্রভু! প্রভু! থামুন! শুনুন। আপনাকে আমার সঙ্গে একবার লালবাজারে যেতেই হবে। যেতেই হবে প্রভু, এখনি। এই কথাগুলো, হ্যাঁ, এই কথাগুলো, আমাকে না শুনিয়ে শোনাতে হবে পুলিস কমিশনারকে। আসুন। না—না, না গেলে চলবে না। যদি না যান, হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাব। আপনাকে নিয়ে গিয়ে সোজা সাহেবকে গিয়ে বলব, 'স্যার' যাঁকে ধরতে পাঠিয়েছিলেন, ধরে আমি এনেছি, কিন্তু এঁর কথাগুলো শুনে ভেবে দেখুন, গবর্ণমেণ্টকে লিখবেন কি না—পেনালকোড থেকে ৩৭৯ ধারা তুলে দাও!"

হর্য্যানন্দ॥ বুঝলাম বাবা ক্যাবলাকান্ত, কংসানুচর, চিনলাম বাবা তুমি কী চিজ! তা চলো। লালবাজার! সে তো আমার তীর্থ! মহাতীর্থ ওরে, ঐ কংস-কারাতেই যে ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দনের জন্ম! কতবার গিয়েছি, তবু তো আশা মেটে না! চলো বাবা চলো, আমায় নিয়ে চলো, নইলে তো তোমার চাকুরি থাকবে না বাবা! একি···প্রণাম কর, ভূভারহরণ শ্রীনন্দনন্দনকে প্রণাম কর্ ব্যাটা, ভুলিসনে যে ওঁর অনুগ্রহে আমাদের অন্ন, আমাদের অন্নে তোদের অন্ন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

হ্যাচ্চু

[নিশীথ রাতের কলিকাতা। একটি নির্জন পার্ক। পার্কের এক কোণে শ্বেত পাথরের বেদীর উপরে চতুষ্কোণ স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরে একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি। এই মর্মর মূর্তিটি স্বর্গগত বিখ্যাত এক দেশনেতার। স্তম্ভগাত্রে একটি ফলক। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ ঃ

"সত্যাশ্রয়ী ও নির্ভীক, জিতেন্দ্রিয় ও কর্মযোগী পরদুঃখকাতর ও দানবীর স্বনামধন্য দেশনেতা সেবাব্রত চৌধুরীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ। জন্ম ১৩০৬ সন ২৫শে আষাঢ়—মৃত্যু ১৩৬০ সন ১২ই, আশ্বিন।"

আশ্রয়হীন একটি বেকার যুবক এই স্মৃতি ফলকে লিপিবদ্ধ কথাগুলি উচ্চৈস্বরে পাঠ করিতেছিল।]

যুবক॥ (পাঠ শেষ হইলে) পরদুঃখকাতর! দানবীর! হায় হায় কি দুর্ভাগ্য আমি! কলকাতা সহরে আমি চাকরীর খোঁজে এসে পড়েছি কখন? হায় হায় এই মহাপুরুষটির স্বর্গগমনের পর। কয়েক বছর আগে যখন এই মহাপুরুষ বেঁচে ছিলেন, হায় হায় তখন যদি আসতে পারতাম কলকাতায়, এই মহাপুরুষের পায়ে গিয়ে পড়লে একটা কিছু সুরাহা আমার হতোই হতো। হায় হায় কবি ঠিকই বলেছেন! "অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।"

[ঐ অঞ্চলে পাহারারত একটী কনেষ্টবলের প্রবেশ]

কনেষ্টবল॥ এখানে এতো রাতে তুমি কি করছো?

যুবক॥ আমাকে তুমি বলছেন কেন আপনি?

কনষ্টেবল্॥ চোর জোচ্চোরদের তুমি বলবো না তো কি বলবো?

যুবক॥ আমি চোর জোচ্চোর? কোন অধিকারে আপনি আমাকে চোর জোচ্চোর বলছেন?

কনষ্টেবল ॥ রাত একটার সময় ভদ্রলোক এই নির্জ্জন পার্কে হাওয়া খেতে আসেন না। আর তা ছাড়া, তোমার চেহারা আর পোষাক যা দেখছি, তাতে তোমাকে কোন সাধু পুরুষ বলে মনে করতে পারছি না।

যুবক ॥ সাধু পুরুষের পরিচয় কি চেহারা আর পোষাকে লেখা থাকে ?

কনষ্টেবল ॥ তুমি তো বেশ গোলমেলে লোক দেখছি। চলো, থানায় চলো।

যুবক ॥ বাঁচালেন আমাকে আপনি। কী উপকার যে করলেন তা আর কী বলবো ? চলুন।

কনষ্টেবল ॥ সে কি হে ? তোমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবো, সেটা হোলো গিয়ে তোমার উপকার ?

যুবক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, উপকার। পরম উপকার। একটা চাকরী-বাকরীর খোঁজে গ্রামে থেকে সহরে এসেছিলাম মাসখানেক আগে। যে ক'টা টাকা সঙ্গে ছিল পাইস্ হোটেলে খেতে খেতে শেষ হয়ে গেছে। মাথা গোঁজবার কোনো আশ্রয় নেই বলেই রাতটা কাটাই রেলষ্টেশনের প্লাটফর্মে, নইলে পার্কে। কিন্তু সেখানেও পুলিশের তাড়া খেতে হয়—যেমন এখন খাচ্ছি। আজ মনে হচ্ছিল এখন আমার একমাত্র আশ্রয় দয়াময় সরকারের জেল। যেখানে যেতে পারলে একেবারে রাজ-আতিথ্য —খাওয়া-পরা আর মাথা গোঁজবার সব সমস্যার অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান।

কনষ্টেবল ॥ তুমি কি বলছো হে ?

যুবক ॥ আজ্ঞে আমি ঠিকই বলছি।

কনষ্টেবল ॥ তবে তো আমি তোমার এই উপকার করবো না। আরো কিছু ভোগো।

যুবক ॥ ও মশাই শুনুন। আমার চেহারাটা দেখছেন ? কাপড়চোপড় ছেঁড়া বটে। কিন্তু হাতের কব্জা আর গায়ের জোর বাপ-মায়ের কৃপায় আপনার চেয়েও বেশী। আপনি আমাকে হাজতবাসের সুযোগ না দিতে চাইলে সে সুযোগ আমি জোর করে আদায় করবো আপনাকে পিটিয়ে।

কনষ্টেবল ॥ ওরে বাবা, সে কি ?

যুবক ॥ হ্যাঁ, মশাই। না খেতে পেয়ে পেয়ে আমি এখন মরীয়া হয়ে উঠেছি।

যুবক কনষ্টেবল-এর হাত চাপিয়া ধরিল

কনষ্টেবল ॥ আরে ! শোনো, শোনো। মারামারি কেন হে ? না খেয়ে আছো—বোসো, বোসো। কিছু খাবার আমিই তোমাকে দিচ্ছি।

যুবক ॥ সেকি ! আপনি মশাই আমাকে খেতে দেবেন ?

কনষ্টেবল ॥ হ্যাঁ, দেবো, দেবো। আমার পরিবারের দিব্যি আছে যে।

যুবক ॥ পরিবারের দিব্যি ! কি দিব্যি ?

কনষ্টেবল ॥ সেটা অত্যন্ত গুপ্ত কথা। এসো বসি। (যুবকটিকে বসাইয়া পকেট হইতে একটি কাগজের মোড়কে রাখা কিছু পুরী ও মিষ্টি বাহির করিয়া যুবকের সামনে রাখিল) তুমি খেতে থাকো। আমি বলছি।

যুবক ॥ (খাইতে খাইতে) আপনি আমাকে অবাক করেছেন মশাই। কি ভাগ্য আমার ! ঐ মহাপুরুষের মুখ দেখেছি বলেই বোধ হয়। হ্যাঁ নিশ্চয়, তাই আপনার মতো মহাপুরুষ কনষ্টেবলের হাত পড়েছি ! না না, ভুল হলো। আপনি তো আপনার পরিবারের নির্দেশে আমাকে খাওয়াচ্ছেন—আমার ধন্যবাদটা বোধ হয় তারই বেশী পাওনা। এই খাওয়ানো ছাড়া আরো কিছু নির্দেশ আছে নাকি তার ? বলুন না আপনার পরিবারের কী আদেশ আছে আপনার উপর ?

কনষ্টেবল ॥ তুমি বেশ বলো দেখছি। আমি বললাম নির্দেশ, তুমি বলছো আদেশ ! তা আদেশই বটে ! (হাস্য) তোমাকে গোপনে বলছি আমার অফিসারের আদেশ—সেও আমি সব সময়ে মানি না, কিন্তু আমার গিন্নীর আদেশ—সে আমি মানবোই। কারণ, দেখেছি—তাতে দিন দিন আমার ভালো হচ্ছে।

যুবক ॥ বুঝছি, সাক্ষাত দেবী তিনি। তা সেই দেবীর আদেশ-টাদেশগুলো বলুন না আমাকে।

কনষ্টেবল ॥ তিনি বলেন, আমি লোকটি খুব সুবিধার নই। মিছে

কথাতো বলিই—তা ছাড়াও নীতিবিরুদ্ধ কাজকর্মও কিছু কিছু করি। তাতে আমি বলি—দু-একটা মিছে কথা কি দু একটা অকাজ কুকাজ শুধু আমি কেন—কে না করছে আজ? আর আজই বা কেন? চিরদিন চিরকালই মানুষমাত্রেই এ সব করেছে।

যুবক ।। না না সে কথা বলবেন না, আপনি সকলের কথা ধরবেন না। এই ধরুন এই মহাপুরুষটি—যার বেদীতলে আমরা বসে আছি। ঐ পড়ে দেখুন, লেখা আছে—সত্যাশ্রয়ী, জিতেন্দ্রিয়···বিশেষণগুলো একবার দেখুন। যার মুখখানি দেখেছিলাম বলে আজ আপনার মতো দয়াবান লোকের হাতে আমি এই খাবার পেয়ে বেঁচে গেলাম। সবাই অসাধু নন। তবে আপনি-আমি হয়তো মাঝে মাঝে—

কনষ্টেবল ।। হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমরা তো আর মহাপুরুষ নই। অতিসাধারণ মনুষ্য আমরা। আজকাল যা দিন পড়েছে—আমাদের একটু ভুলভ্রান্তি হওয়া—হ্যাঁ, তা হয় বৈ কী। তাই আমার পরিবার বলেন, বলেনও বলবো না—একেবারে, আদেশই দিয়েছেন—ডিউটি সেবে যখন বাড়ী আসবো, তার, আগে—কোনো ভিখিরিকে যেন আমি কিছু খেতে দিই। তিনি বলেন, এতে দিনের ছোটখাটো পাপ-টাপগুলো—অবশ্য আমি এগুলোকে পাপ-টাপ না বলে, 'হরির কৃপায় দশ জনে খায় আমরাই কেন খাব না, বলতে চাই—তা সে যাই হোক—তিনি বলেন, ও সব ধুয়ে মুছে যায়। আর ঐ ভিখিরী যদি খেতে পেয়ে আশীর্বাদ করে তাহলে দেখেছি পরদিন্ উপরি রোজগারটা আমার বেড়ে যায়—। (হাস্য)

যুবক ।। ভালো ভালো, এ বিশ্বাসটা থাকা ভালো। তাতে একটা হতভাগা লোক, সেও খেয়ে বাঁচছে, অন্ততঃ একটা রাত খেয়ে বাঁচছে—আর আপনিও দুটো পয়সার মুখ দেখছেন। আমার তো মশাই কেন যেন মনে হচ্ছে এই যে মহাপুরুষ—যাঁর বেদীতে আমরা বসে এই সব ধর্মকথা আলোচনা করছি—এই মহাপুরুষের ঐ পাথরের মুখটি—এ মশাই আমি রোজ দেখবো। যেমন আজ দেখেছি। তাতে আর কিছু না হোক, আমার যেন কেমন বিশ্বাস হচ্ছে—অন্ততঃ রোজ রাতে আমার ভরাপেট খাবার জুটবে। যেমন আজ জুটলো।

কনষ্টেবল ।। না না, তোমাকে আমার আরও কিছু বলবার আছে। তার আগে অবশ্য তোমাকে আমি ওই কল থেকে জল খেয়ে নিতে বলছি।

যুবক ।। যা বলেছেন। পেট ভরে গেছে। এখন ঐ কল থেকে দু'আঁচলা জল খেলেই দেখবেন আমি বেশ ভালো লোক। কাউকে ঠকানোর মনোবৃত্তি আমার একেবারেই নেই। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আমার পাশে দু'দণ্ড বসে আপনি আপনার পরিবার—পরিবারই বা কেন বলি, বরং বলবো সেই দেবীর আরো দু'চারটি মহান্ আদেশ যা তিনি দিয়েছেন আমাকে বলতে পারেন।

[যুবকটি জল খাইতে গেলো। কনষ্টেবলটি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। ইতিমধ্যে যুবকটি প্রত্যাগমন করিল]

যুবক ॥ আঃ। কী তৃপ্তি যে হোলো আজ। খাবারগুলো বেশ ভালো ছিলো।

কনষ্টেবল ॥ তা আর হবে না? খাবারগুলি যে "মধুর ভারত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের।"

যুবক ॥ যদি কিছু মনে না করেন—বড়ো কৌতুহল হচ্ছে—জানতে—ক' টাকার খাবার আপনি আমাকে খাওয়ালেন। মানে, এতো ভালো খাবার আমি এর আগে খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না কিনা। আর তাই দামটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনষ্টেবল ॥ দাম কি আর আমিই জানি বাপু? ও সব—

যুবক ।। ও—

কনষ্টেবল ।। হ্যাঁ।

যুবক ॥ ও তা বেশতো বেশতো। আমি ধরে নিচ্ছি— অমূল্য। অথবা যে দামে আপনি কিনেছেন আমাকেও সেই কেনা দামেই দিয়েছেন।

কনষ্টেবল ॥ (হাসিয়া) তুমি বেশ বলো হে। কিন্তু এবার তোমাকে যা দিচ্ছি এটা একেবারে ঘরের। গিন্নীর নিজের হাতের তৈরী।

নাও। (পকেট হইতে একটি পানের ডিবা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি পান দিয়া) খাও।

যুবক ॥ পান! বা-বা-বা। আপনি বুঝি খুব পান খান?

কনষ্টেবল ॥ না না, পান-দোষটোষ আমার নেই।

যুবক ॥ কিন্তু আমি তো প্রায়ই দেখি—বেশীর ভাগ কনষ্টেবলই পানের দোকানের সামনে ডিউটি দেয়।

কনষ্টেবল ॥ তা দিক। কিন্তু এই ছাখো আমার দাঁত সাদা।

যুবক ॥ তবে স্যার আপনার পকেটে পানের ডিবো কেন।

কনষ্টেবল ॥ ওটা গিন্নীর আদেশ। তিনিই একডিবে পান সঙ্গে দেন—মানে আমাদের কাছেও তো অনেকে পান খেতে চান যে। গিন্নী বলেন, শুধু সেলাম করতে নেই। বুঝেছো?

যুবক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। সেলাম আর সেলামী।

কনষ্টেবল ॥ বাঃ। কী সুন্দর তুমি বলো। তোমাকে একদিন আমার বাড়ী নিয়ে যাবো হে। ও হো-হো, তা তো হবে না। তাঁর আবার দ্বিতীয় নির্দেশটাও রয়েছে কিনা।

যুবক ॥ ও, তবে দ্বিতীয় নির্দেশও আছে? বলুন না, সে আদেশটা কী? আমার তো এখান থেকেই তাঁকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনষ্টেবল ॥ (চটিয়া গিয়া) প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে? সে যে কী চিজ্ তা জানো না তো—তাই। দ্বিতীয় নির্দেশটা শুনলেই তা বুঝবে।

[সঙ্গে সঙ্গে রুল দিয়া যুবকটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।]

যুবক ॥ একী! একী, আপনি আমাকে ঠ্যাঙাবেন কেন?

কনষ্টেবল ॥ কী করবো? তাঁর আদেশ! বলেছেন, প্রথমে খাওয়াবে—তারপর ঠ্যাঙাবে।

যুবক ॥ আরে শুনুম—শুনুন—ঠ্যাঙাবেন কেন?

কনষ্টেবল ॥ বলেছেন, খুব ঠেঙিয়ে দেবে যাতে আর কোনোদিন তোমার কাছে কিছু না চায়—তোমার পিছু না নেয়—তোমার বাড়ী

ধাওয়া না করে। বলো, এ সব করবে না, তবে আমি তোমাকে রেহাই দিচ্ছি। নইলে—

[আবার মারিতে উদ্যত হইল।]

যুবক ॥ না না, না মশাই, আমি কথা দিচ্ছি আমি আর আপনার মুখই দেখবো না। মুখ দেখবো শুধু একটি লোকের—হ্যাঁ ঐ মহাপুরুষের। আপনি এখন স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন, আমি এখন এই মহাপুরুষের পায়ের তলায় পড়ে ঘুমুবো।

কনষ্টেবল ॥ রাত বারোটার পর পার্কে থাকাও বে-আইনি।

যুবক ॥ তবে মশাই আমাকে হাজতে নিয়ে চলুন, আমি তো তাই চাইছি।

কনষ্টেবল ॥ না না—ও-সব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যাবো না। এখন ওই পানওয়ালীর দোকানটার উপর নজর রাখতে হবে—

যুবক ॥ আরে মশাই, আপনি তো পান খান না—

কনষ্টেবল ॥ (হাসিয়া) ঐ পানওয়ালীর পান দু' একটা খাই।

যুবক ॥ (ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে) ও।

কনষ্টেবল ॥ হ্যাঁ।

যুবক ॥ বেশ তো, বেশ তো। তা যান না। শুভস্য শীঘ্রং।

কনষ্টেবল ॥ তোমাকে একটা কথা না বলে যেতে মন সরছে না।

যুবক ॥ কী বলুন তো ?

কনষ্টেবল ॥ এখানে তোমার না থাকাই উচিত। না না, আইনের কথা আমি ছেড়েই দিচ্ছি। আসল কথা হচ্ছে এই, এই মূর্তিটার আশে পাশে অনেকে অনেক কিছু দেখেছে বেশী রাতে। আমার মনে হয় চোরাকারবারীরা আসে। আর তারাই রটিয়েছে এই ভূতের ভয়।

যুবক ॥ এ্যাঁ ?

কনষ্টেবল ॥ হ্যাঁ। একজন ভয় পেয়ে মারাও গেছে শুনেছি।

যুবক ॥ তাই নাকি ? তবে তো আর এখান থেকে আমি কিছুতেই নড়ছি না '

কনষ্টেবল ॥ তোমার প্রাণের ভয় নেই ?

যুবক ।। খেতে না পেলে ঐ একটা ভয়ই থাকে না। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার ব্যবস্থা করে দিন—দেখবেন প্রাণের ভয় আমারই হবে সবচেয়ে বেশী।

কনষ্টেবল ।। না তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারিনে। আমার ডিউটি আছে।

"লোকে বলে প্রেম করেছি, প্রেম কারে কয় জানিনে,
মনের মানুষ মন নিয়েছে, লোকের কথা মানিনে।"

[গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান করিল। যুককটিও ঐ গানের কলিটি গুণগুণ করিতে করিতে একটি ইঁট সংগ্রহ করিয়া মাথায় দিয়া বেদীর উপরে শয়ন করিল এবং অনতিকালের মধ্যে নিদ্রাচ্ছন্ন হইল। কিছুপরে ঐ স্থানে একটি উন্মাদিনী নারী চুপি চুপি চোরের মতো প্রবেশ করিয়া হাতের যষ্টিটি দিয়া মূর্তিটিকে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করিতে লাগিল। এই শব্দে যুবকটির ঘুম ভাঙিতেই সে ধড়মড় করিয়া সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিল।]

যুবক ।। একি! একি! কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এ সব?

নারী ।। Shut up. Get out.

যুবক ।। সেকি!

নারী ।। I say, get out. বেরিয়ে যাও!

যুবক ।। বেরিয়ে যাবো মানে? তুমি ঐ মহাপুরুষকে—

নারী ।। ম-হা-পু-রু-ষ! হাঃ হাঃ হাঃ! তোমরা জানো মহাপুরুষ। কিন্তু আমি জানি উনি কে এবং কি।

যুবক ।। দেশশুদ্ধ লোক ওঁকে মহাপুরুষ বলে জানে—আর তুমি একটা পাগলি—

নারী ।। Shut up. I am his wife. বাংলা করে বলছি, আমি ওঁর স্ত্রী। আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না ওঁকে।

যুবক ।। আপনি ওঁর স্ত্রী? স্ত্রী হয়ে আপনি আপনার স্বামীকে ঠেঙাচ্ছেন?

নারী ।। হ্যাঁ ঠ্যাঙাচ্ছি। ঐ ষ্ট্যাচু আমি ভাঙ্গবো। ঐ বেদী আমি চুরমার করবো।

[লাঠি দিয়া পুনরায় আঘাত করিতে উদ্যত হইলে যুবকটি উঠিয়া পিঠ দিয়া মূর্তিটিকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল।]

নারী॥ (ইহাতে নিরস্ত হইয়া) ও। তবে তোমাকে সব খুলে বলতে হবে দেখছি। তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে হবে যে এই লোকটা সত্যাশ্রয়ী নয়, জিতেন্দ্রিয় নয়। ঐ ভণ্ড লোকটির মুখোসটা খুলে দিতে হবে। বেশ তবে বোসো।

[বেদীতটে উভয়েই বসিল]

নারী॥ ঐ সূচী-ফলকে যা যা লেখা আছে ওর একটি কথাও মিথ্যা নয় বলেই ছিলো আমার ধারণা। আর সে জন্য আমার গর্বের ছিলো না সীমা। গৌরবের ছিলো না শেষ। আমার মনে হতো জগতে আমার চেয়ে ভাগ্যবতী খুব কমই আছে। বাল্যকাল থেকেই শংকরের মতো স্বামী পেতে গৌরীর মতো তপস্যা করেছিলাম আমি। আমার মনে হতো ঈশ্বর আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। (হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল) আমার সেই স্বামী মারা গেলেন কবে জানো? ঐ লেখা আছে, ১২ই আশ্বিন ১৩৬০। আমার মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে সব আলো গেলো নিভে।

যুবক॥ ওঁকে হারিয়ে বহু লোকই অনাথ হয়েছিলেন মা। ঐ স্মৃতিফলকের লেখা থেকেই তা বুঝছি।

নারী॥ আমারও তাই মনে হতো। আমিও তাই ভাবতাম! ওঁকে ছেড়ে বাঁচা আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠলো বাবা। ওঁর মৃত্যুর পর আমার মৃত্যুর জন্য আমি তপস্যা করেছি বাবা।

যুবক॥ আমি সেটা বিশ্বাস করছি মা।

নারী॥ শেষে সেই মৃত্যু আমার এল। মরতে বসে এতো আনন্দ কারো হয় না—যেমন আমার হয়েছিলো বাবা। কেবলই মনে হচ্ছিল আমি যেন চলেছি এক মহাঅভিসারে আমার স্বামীর মহাজীবনের স্বর্গে। হিন্দু নারী, আমরা বিশ্বাস করি, শেষ নিঃশ্বাসে যে কামনা করে মানুষ —জীবনের পরপারে তা হয় পূর্ণ। আমিও তাই আমার শেষ নিঃশ্বাসে এই প্রার্থনাই করেছিলাম আমার যেন স্থান হয় আমারই স্বামীর শ্রীপাদপদ্মে—মহাস্বর্গে।

যুবক ॥ বুঝতে পেরেছি। মৃত্যুর দুয়ারে গিয়েও আপনি বেঁচে উঠেছেন। আর সেই শোকে হয়েছেন পাগল।

নারী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি কিছুই বোঝোনি, কিছুই বোঝোনি তুমি।

যুবক ॥ হ্যাঁ, আপনার সব কথাই যে আমি বুঝবো এ স্পর্ধা আমি রাখি না। যাঁরা প্রকৃতিস্থ, তাঁদেরই অনেক কথা আমরা বুঝি না। কিন্তু তবু বলুন, আমি শুনবো। বলুন মা, বলুন।

নারী ॥ স্পষ্ট বুঝলাম আমার মৃত্যু হলো। একি তুমি মুখ ফিরালে যে? তুমি হাসছো বুঝি? (রাগে ও ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি হাসছো? তুমি হাসছো?

যুবক ॥ শুনুন মা শুনুন। হাসা তো দূরের কথা—আপনাকে দেখে আমার কী যে কষ্ট হচ্ছে—আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। কত বড়ো লোকের স্ত্রী আপনি, আর আপনার কিনা আজ এই দশা।

নারী ॥ আমার দুঃখে অকাশ বাতাসও আজ কাঁদে। সব শুনলে তুমিও এখনি কাঁদবে।

যুবক ॥ আপনি মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। এই আপনার দুঃখ, না?

নারী ॥ (চটিয়া গিয়া) you are all fools. (কাঁদিয়া) কাউকে আমি আমার কথা বোঝাতে পারি না—মরতে আমি চেয়েছিলাম, ঈশ্বর আমার সে প্রার্থনা শুনেছিলেন। আমার মৃত্যু হলো। যে মৃত্যু আমি কামনা করেছিলাম সে মৃত্যু আমার হলো। কিন্তু মৃত্যুকালে যে কামনা করেছিলাম তা আমার পূরণ হলো না।

যুবক ॥ কেন? কেন মা?

নারী ॥ এই স্মৃতি ফলকটির জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই স্মৃতিফলকটির জন্য।

যুবক ॥ সে কী মা? কেন বলুন তো?

নারী ॥ আমার অন্তিমবাসনা হলো পূর্ণ। স্বামীর সঙ্গে আমার হলো সাক্ষাৎ। কিন্তু সে সাক্ষাৎ কোথায় হলো জানো?

যুবক ॥ বলুন ?

নারী ॥ স্বর্গে নয়, স্বর্গে নয়।

যুবক ॥ তবে ?

নারী ॥ নরকে।

যুবক ॥ ন-র-কে !

নারী ॥ হ্যাঁ, নরকে।

যুবক ॥ নরকে কেন মা ? নরকে কেন ?

নারী ॥ ঐ স্মৃতিফলকে লেখা রয়েছে সত্যাশ্রয়ী সে। জিতেন্দ্রিয় সে। আমিও তাঁকে তাই জানতাম। দেশের লোকেও তাই জানতো। কিন্তু সে যে একটা মিথ্যা মুখোস পরে ত্বনিয়ার সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গেছে—তা জানতেন শুধু ঈশ্বর। আর জানতো অবশ্য সে নিজে। জীবনের পরপারে আমার সঙ্গে যেই দেখা, তখন আর সে তাকাতে পারে না আমার দিকে।

যুবক ॥ ওঃ।

নারী ॥ হ্যাঁ। তাঁর মুক্তি হয়নি। তাঁর মুক্তি হয় নি। সংগতি হয়নি তাঁর। কেন জানো ?

যুবক ॥ আপনিই বলুন।

নারী ॥ তাঁর জীবনের মিথ্যেটাই অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই স্মৃতিস্তম্ভরূপে—এতে তাঁর পাপ আরো বেড়ে যাচ্ছে—আরো বেড়ে যাচ্ছে।

যুবক ॥ ও।

নারী ॥ হ্যাঁ। যতলোক এই স্মৃতিস্তম্ভে এই লেখাটি পড়ছে তারা সবাই তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে—

যুবক ॥ আমিও করেছি মা।

নারী ॥ তুমিও করেছো ? তবে তুমিও তার পাপ আরো বাড়িয়ে দিয়েছো। এক একটি লোক তাঁর এই স্মৃতিফলকে লেখা প্রশস্তি পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কষাঘাত সে ভোগ করছে নরকে। হ্যাঁ, এই হয়েছে তাঁর শাস্তি—এই হয়েছে তাঁর শাস্তি ! সে যে কী অবর্ণনীয় কষ্ট,

জীবিত তোমরা, বুঝবে না, বুঝবে না। আমি তা স্বচক্ষে দেখে, সহ্য করতে না পেরে, রোজ রাতে চলে আসি এখানে—ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙতে। কিন্তু আমার কি সাধ্য সুদীর্ঘ জীবনে মিথ্যার যে সুদৃঢ় সৌধ সে রচনা করে গেছে আমি তা ধূলিসাৎ করবো!

যুবক॥ তাইতো! তাইতো মা।

নারী॥ এই মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মুক্তি নেই বলে আমারও নেই মুক্তি।

যুবক॥ তাইতো।

নারী॥ একটা উপকার তুমি আমায় করবে বাবা?

যুবক॥ বলুন মা।

নারী॥ একটা ডিনামাইট দিয়ে এটা উড়িয়ে দিতে পারো বাবা?

যুবক॥ ডিনামাইট আমি কোথায় পাবো মা?

নারী॥ তাও তো বটে। আচ্ছা বলতে পারো বাবা, আমাদের দেশে এটম্‌বোম্‌ কবে পড়বে?

যুবক॥ না মা, এ্যাটমবম্‌ আর পড়বে না। যাদের হাতে এ্যাটমবম তারা এটা বুঝে গেছে—এ্যাটমবমের লড়াই সুরু হলে পৃথিবীটাই হবে ধ্বংস, বাঁচবে না কেউ।

নারী॥ তবে—তবে—এই মিথ্যার জয়-ধ্বজাটাই কি সত্য হয়ে থাকবে?

যুবক॥ যতদিন মিথ্যা আর মেকী থাকবে আমাদের সভ্যতার ভিত্তি ততদিন ঐ ষ্ট্যাচু অক্ষয় হয়েই থাকবে—কারো সাধ্য নেই ওটা ভাঙে।

নারী॥ তবে?

যুবক॥ এই সভ্যতার প্রথম ঘোষণাই ছিল মনের কথা গোপন রাখতেই হয়েছে ভাষার সৃষ্টি। তাতেই সুরু হয়েছে সমাজ জীবনে মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা আর ছলনা।

নারী॥ তুমি মিথ্যা বলোনি, স্ত্রীর মন রাখতেও স্বামী করেছেন মিথ্যাচার।

যুবক ॥ সমাজ-জীবনের ভিত্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছে মিথ্যাচার। পেটে ক্ষুধা নিয়েও মুখে রেখেছি লজ্জা। কপালে করাঘাত করে বলেছি এ দুঃখ এ দারিদ্র্য আমাদের অদৃষ্টের দোষ। হ্যাঁ, জিবনটাই হয়ে এমনি দাঁড়িয়েছে একটা মিথ্যার স্তুপ।

নারী ॥ ভেঙে ফেলো সেই মিথ্যার জঞ্জাল। ভেঙে ফেলো ঐ ষ্ট্যাচু। সুরু হোক সত্যের জয়যাত্রা।

যুবক ॥ সুরু হয়ে গেছে মা। আর আমরা স্বীকার করি না—মনের ভাব গোপন করতেই ভাষার সৃষ্টি। আজ আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে শিখেছি আমাদের মনের সংকল্প।

নারী ॥ কি সে সংকল্প বাবা?

যুবক ॥ আবার আমরা বাঁচবো। বাঁচবার জন্য আবার আমরা লড়াই করবো।

নারী ॥ হ্যাঁ বাবা, এটা খুব সাহসের কথা।

যুবক ॥ পেটের ক্ষুধাই জুগিয়েছে এই সাহস। আর এই সাহসেই নিহিত রয়েছে সত্যের জয়—মিথ্যার ক্ষয়।

নারী ॥ একদিন তবে ঐ ষ্ট্যাচু ধ্বংস হবে তো বাবা?

যুবক ॥ নিশ্চয়।

নারী ॥ যাক্—আশার কথাই শুনে যাচ্ছি তোমার মুখে।—মিথ্যা আর মেকি ধ্বংস হোক। মিথ্যাপাশবদ্ধ মানব আত্মার মুক্তি হোক। মুক্তি হোক।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান]

যুবক ॥ হোক না কেন পাগল, কিন্তু কথার দাম আছে। এর পর আর কি ঘুম আসবে? দেখি।

[ইঁটটিকে আবার বালিশ করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই অদূরে গীতরত কনষ্টেবলটির আবির্ভাব হইল। যুবকটি উঠিয়া বসিল।]

কনষ্টেবল ॥ "লোকে বলে প্রেম করেছি,
প্রেম কারে কয় জানিনে,
মনের মানুষ মন নিয়েছে,
লোকের কথা মানিনে"।

কি গো, ঘুমোও নি যে ?

যুবক ॥ ঘুমোবার কি আর জো আছে ? আপনি মশাই যাবার পরই এসেছিলো একটা পাগলী। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। বলে, সে নাকি এই মহাপুরুষের স্ত্রী।

কনষ্টেবল ॥ সে কি হে ? এ মহাপুরুষের স্ত্রী তো বছর দুই হলো মারা গেছেন।

যুবক ॥ আপনি কি বলছেন মশাই ? মারা গেছেন ? এই পাগলীটাও তাই বলছিলো বটে—

কনষ্টেবল ॥ ঠিকই বলেছে। হরসুন্দরী পার্কে এঁর স্ত্রীরও ষ্ট্যাচু রয়েছে। দেখনি বুঝি ?

যুবক ॥ আপনি বলছেন কী মশাই ?

কনষ্টেবল ॥ দেখতে চাও ?

যুবক ॥ তবে কি—তবে কি—

[থামিয়া গিয়া অন্যদিকে তাকাইল]

কনষ্টেবল ॥ মনে হচ্ছে হঠাৎ ভয় পেলে যেন ?

যুবক ॥ পাগলীটা বলছিলো, এঁরই স্ত্রী সে। পরপার থেকে চলে এসেছে। মিথ্যার এই জয়স্তম্ভটা ভেঙে ফেলতে !

কনষ্টেবল ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া) আরে কথায় বলে— 'কিনা বলে পাগলে, আর কিনা খায় ছাগলে।' হাঃ হাঃ হাঃ।

[গীতকণ্ঠে প্রস্থান।

যুবকটি ক্ষণকাল ষ্ট্যাচুটিকে এক দৃষ্টে দেখিল। ক্রমশঃ সে উত্তেজিত হইয়া ষ্ট্যাচুকে প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারিতে লাগিল—ক্লান্ত হইয়া শেষে উহা ভূপাতিত করিতে চেষ্টা করিল। পশ্চাতে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল সেই নারীটি—আগ্রহ এবং আনন্দ উদ্ভাসিত আননে। অভিভূত মনে কম্পিত হাতে আশীর্বাদ করিল যুবককে।]

যবনিকা

ভারতবর্ষ
শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

মানুষের কামড়ে

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ডমরু'র কার্যালয়। ছোট ঘর। দেয়ালে দীর্ঘদিন চুনকামের অভাব। দুটি টেবিল, গুটিকত চেয়ার এবং একটি আলমারি। টেবিলের উপর কাগজ-পত্র, ফাইল ; মোটকথা অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। কিন্তু তবুও এই পত্রিকার টিকিয়া থাকার ব্যাপারে সন্দেহ দূর হয় না। ঘরের পিছনে এবং ডান দিকে দুটি দরজা। পিছনের দরজাটি বাইরের দিকে যোগাযোগের জন্য এবং ডান দিকের দরজা স্বত্বাধিকারী—সম্পাদক পিনাকী পাইনের বাড়ী এবং প্রেসে যাইবার রাস্তা। ঘরে পিনাকী একা টেবিলে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছে, একটু পরে স্ত্রী মন্দিরা এক পেয়ালা চা এবং দুখানি বিস্কুট লইয়া প্রবেশ করিল। সকাল।

মন্দিরা॥ (চায়ের পেয়ালা সামনে রাখিয়া) এই রইলো তোমার পাঁচন।

পিনাকী॥ (চমকিয়া) এ্যাঁ?

মন্দিরা॥ সকাল বেলার পাঁচন গেলো।

পিনাকী॥ ওঃ, বুঝলাম। গোয়ালা দুধ দেয়নি—চিনি কেনার পয়সা নেই—পাঁচন মানে চিনি দুধ ছাড়া চা। তা মন্দ কি? চৈনিক চা। তবে দৈনিক না হলেই বাঁচি।

মন্দিরা॥ আজ ঘরে চালও বাড়ন্ত।

পিনাকী॥ ঘাস খাও।

মন্দিরা॥ কি বললে?

পিনাকী ॥ ঘাস খাও। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঘাস ভিটামিনে বোঝাই। না না আমি বলছি না, বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, আমাদের কর্ত্তারাও বলছেন, এই আজকের কাগজেও আছে।

মন্দিরা ॥ যাঁরা বলেছেন তাঁরা খান।

পিনাকী ॥ (কাগজ পড়িতে পড়িতে) এই যে ঘাসের বড়া, ঘাসের চপ, ঘাসের পোলাও—

মন্দিরা ॥ (রুখিয়া উঠিয়া) তুমি খাও, তুমি খাও। আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে যতো পারো গেলো।

পিনাকী ॥ (ভয়ে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল) ও বাবা! কামড়াবে নাকি? (কাগজটি চট করিয়া দেখিয়া লইয়া) আজকের কাগজেই আছে—"মানুষের কামড়ে এগারজন মানুষ আহত।"

[বাহিরের দরজা দিয়া এই পত্রিকার ম্যানেজার এবং মন্দিরার ভাই মৃদঙ্গের প্রবেশ।]

মৃদঙ্গ ॥ কিসের কামড়ে কি আহত?

পিনাকী ॥ মানুষের কামড়ে এগারজন মানুষ আহত। একটা আরো বাড়ছিলো, উনি—আমাকে—

মন্দিরা ॥ [মৃদঙ্গকে প্রায় কাঁদিয়া] আর তো পারি না আমি। আমাকে বাঁচাও ছোড়দা।

মৃদঙ্গ ॥ হচ্ছে, হচ্ছে, সব ব্যবস্থাই হচ্ছে। বাবাও বলছিলেন তোকে নিয়ে যেতে।

পিনাকী ॥ জোড়ে যেতেই বলেছেন হয়তো, কি বলো? আঃ, শ্বশুরবাড়ী কতদিন যাইনি। [মন্দিরাকে] যাও গো, গোছগাছ করে নাও।

মন্দিরা ॥ আমাকে না বলে পালিও না কিন্তু ছোড়দা। অনেক কথা আছে। [চলিয়া গেল]

মৃদঙ্গ ॥ ব্যাপার কি পিনাকীদা?

পিনাকী ॥ কিছুনা, কিছুনা, ফ্যামিলি অর্কেষ্ট্রা।

মৃদঙ্গ ॥ না, না, খুলে বলো।

পিনাকী ॥ আমার নাম 'পিনাকী' পাইন। আমার স্ত্রীর নাম 'মন্দিরা' পাইন। শ্যালক তুমি, তোমার নাম 'মৃদঙ্গ' মিত্র, আর সর্বশেষ আমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকাটিরও নাম 'ডমরু'। অতএব বুঝতেই পারছো সমস্বরে বেজে উঠলেই অর্কেষ্ট্রা। তবে কাগজ আর সংসারের অবস্থা প্রায় 'অন্তভক্ষ্য ধনুগুর্ণ'। কাজেই অর্কেষ্ট্রায় বাজছে তাণ্ডব।

মৃদঙ্গ ॥ তাই বলে কামড়াকামড়ি?

পিনাকী ॥ আজ ঘরে ঘরেই প্রায় এই ব্যাপার। মানুষ খেতে না পেয়ে খ্যাপা কুকুরের মতো যাকে পাচ্ছে তাকে কামড়াচ্ছে। বিশ্বাস না হয় এই দেখো। আনন্দবাজারের আজকের এই চিত্তাকর্ষক সংবাদটা দেখো। আমিই পড়ে শোনাচ্ছি। এই দেখো বড়ো বড়ো হেডলাইন। "মানুষের কামড়ে এগারজন মানুষ আহত। কলিকাতা পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের বিবরণ। কলিকাতা পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের রিপোর্ট হইতে জানা যায় মানুষের কামড়ে আহত এগারজন মানুষের চিকিৎসা করা হয়। তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই বৎসর ঘোড়ার কামড়ের ২টি ঘটনা, গরুর কামড়ে ১৪টি, বানরের কামড়ে ৫৩টি, শৃগালের কামড়ে ৫৭, বিড়ালের কামড়ে ১৮, এবং কুকুরের কামড়ে ১৪০৩টি কেস ইনষ্টিটিউটে চিকিৎসা করা হয়। মারা গিয়াছে গাধার কামড়ে ১১ জন, মহিষের কামড়ে ১ জন, ভল্লুকের কামড়ে ১ জন এবং ভেড়ার কামড়ে ২ জন। এতৎব্যতীত এই বৎসর ইনষ্টিটিউটে আঁচড়, কামড় বা লেহনে আহত মোট ১৫৬৫টি প্রাণীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।"

মৃদঙ্গ ॥ ওরে বাবা!

পিনাকী ॥ কিন্তু সবচেয়ে ইণ্টারেষ্টিং হচ্ছে, মানুষের কামড়ে ১১জন মানুষ আহত।

মৃদঙ্গ ॥ সাংঘাতিক ব্যাপার।

পিনাকী॥ হবে না? যা দিনকাল পড়েছে। চালের দর যেমন হুহু করে উঠছে, মানুষ কি আর মানুষ আছে? সব ক্ষেপে যাচ্ছে। তোমার বোনই তো এখনি আমাকে প্রায় কামড়েছিলেন আর কি?···বাবার কাছ থেকে আজ কিছু খসাতে পেরেছো?

মৃদঙ্গ॥ না পিনাকদা। বাবাকে বলেছিলাম আর কিছু টাকা না দিলে আমাদের ডমরু আর বাজছে না।

পিনাকী॥ কি বললেন তিনি?

মৃদঙ্গ॥ বললেন ডমরু কাগজের নামটা পাল্টে দাও।

পিনাকী॥ মানে, মাড়োয়ারী টেকনিক। গনেশ উল্টে নতুন নামে পাওনাদারদের কলা দেখিয়ে—কি বলো? তা বেশ তো, বেশ তো। কি আর একটা নাম হয় বলো তো?

মৃদঙ্গ॥ বাবাই বলে দিয়েছেন। বলেছেন, কাগজের নাম 'ডমরু' বদলে রাখো 'শিঙে'। আর তাই তোমরা দুজনে মিলে ফোঁকো।

[কম্পোজিটার নৃসিংহ সিংহের প্রবেশ। রোগা-পটকা চেহারা। জামা কাপড়ে কালির দাগ। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি।]

পিনাকী॥ এই যে হেড কম্পোজিটর, নৃসিংহ সিংহের প্রবেশ। তোমার নামটা পাল্টাও নৃসিংহ।

নৃসিংহ॥ কেনো স্যার? নামটা কি দোষ করলো?

পিনাকী॥ ওই রোগা-পটকা চেহারায় ওই নাম!

নৃসিংহ॥ চেহারার আর দোষ কি? তিন মাস মাইনে দেন না। কিন্তু আজ মাসের পয়লা। আজ আর ছাড়ছিনে।

মৃদঙ্গ॥ ওরে বাবা, কামড়াবে নাকি?

নৃসিংহ॥ হ্যাঁ তা কামড়াতে পারি। আজ ট্রামে আসতে আসতে একজন কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিলো—মানুষের কামড়ে এগারজন মানুষ আহত।

পিনাকী॥ ওরে বাবা, তুমিও জানো দেখছি। না না কামড়াতে হবে না। শোনো। (মৃদঙ্গকে দেখাইয়া) ম্যানেজারবাবু বিজ্ঞাপনের বিলগুলো নিয়ে এখনি বেরুচ্ছেন। আজ ফার্ষ্ট আওয়ারেই কিছু টাকা পাওয়া যাবে আশা আছে। মৃদঙ্গ— (ড্রয়ার হইতে কয়েকটি বিল বাহির করিয়া) এই নাও, একেবারে শিওর হিট। তুমি ভাই আর দেরী কোরো না। প্রত্যেকটি মিনিট—

মৃদঙ্গ ॥ অত্যন্ত মূল্যবান। বলাই বাহুল্য ! দাও আমি যাচ্ছি।

পিনাকী ॥ দেখো ভাই, দেরী কোরোনা। ওপরে চাল বাড়ন্ত (নৃসিংকে দেখাইয়া) সামনে তিনমাস, আর বাইরে (কান পাতিয়া শুনিয়া) অগণিত পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছ ? সব পাওনাদার। পেপার মার্চেন্ট, ব্লক মেকার, দপ্তরী—এসব তো আছেই তার ওপর মুদী, গোয়ালা, ধোপা, বাড়ীওয়ালা —সপ্তরথী পরিবেষ্টিত এই অভিমন্যুকে যদি বাঁচাতে চাও—

মৃদঙ্গ ॥ কোনোদিন ঘাবড়াওনি—আজ ঘাবড়াচ্ছ দাদা ?

পিনাকী ॥ ঘাবড়াচ্ছি কি সাধে ! এগারজন আহত ! জানো না ? কার মনে কি আছে কে জানে !

মৃদঙ্গ ॥ ওরে বাবা, তাইতো। যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

[বিল লইয়া ত্বরিৎপদে প্রস্থান]

নৃসিংহ ॥ সে মশাই, আপনার যতো পাওনাদারই থাক আমাকে আজ নাম্বার ওয়ান মনে করবেন দয়া করে।

পিনাকী ॥ মানে ?

নৃসিংহ ॥ হ্যাঁ মশাই। শেষে যে বলবেন সব দিতে থুতেই চলে গেলো হে, তুমি বরং—(হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে) মানে এই বরং ফরং আমি আজ আর শুনবো না।

পিনাকী ॥ ও বাবা, কামড়াবে নাকি ?

নৃসিংহ ॥ হ্যাঁ কামড়াবো। কাল আবার কাগজে উঠবে এগারজন নয়, বারোজন।

পিনাকী ।। (সানুনয়ে) শোনো ভায়া শোনো। তুমি আমাদের হেড কম্পোজিটার, তোমার দাম তো আমি বুঝি। রবিঠাকুর রবিঠাকুরই হতেন না যদি না তার লেখা এই কম্পোজিটাররা কম্পোজ করতো। বসো ভাই বসো। ঠাণ্ডা মাথায় একটা বুদ্ধি করা যাক।

নৃসিংহ ।। বলুন।

পিনাকী ।। আজ সব পাওনাদারদের তাড়াতে হবে।

নৃসিংহ ।। (চট করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া) মানে ?

পিনাকী ।। না না তোমাকে নয়। তুমি ছাড়া আর সবাইকে। এবং এই যে তাড়াবো তা তোমারই সাহায্যে।

নৃসিংহ ।। (আবার চট করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া) মানে পাওনাদার ঠেকাতে হবে আমাকে ?

পিনাকী ।। পাওনাদার কামড়াতে হবে তোমাকে।—মানে সত্যি সত্যি কামড়াও আর না কামড়াও, কামড়াতে এগিয়ে যাবে তুমি। (নিজে মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইয়া) মানে, মুখের ভাবটা তোমার হবে এমনি। চোখের দৃষ্টিটা হবে এমনি। দাঁতগুলো যেন সব বেরিয়ে আসবে। গোঁ গোঁ শব্দ করবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে।

নৃসিংহ ।। কোথায় ?

পিনাকী ।। পাওনাদারের দিকে।

নৃসিংহ ।। বলেন কি মশাই, কামড়াতে হবে ?

পিনাকী ।। সেটা তোমার ইচ্ছে। মানে লোক বুঝে।

নৃসিংহ ।। আজ্ঞে মেয়েছেলে পাওনাদার তো আছে। সেই যে ছবি এঁকেছে ?

পিনাকী ।। মেয়েছেলে আর নো মেয়েছেলে ! কামড়াতে ইচ্ছে হয় কামড়াবে, ইচ্ছে না হয় বেশখানিকটা কাছে গিয়ে গা শুঁকবে। মানে, যেমন করেই হোক, পাওনাদার ভাগাতে হবে। আর তাতেই আমারো কিছু থাকবে, তোমারও কিছু থাকবে।

নৃসিংহ ॥ দেখবেন মশাই, কথার খেলাপ না হয়।

পিনাকী ॥ আঃ তুমি আমাকে আজও চিনলে না নৃসিংহ।

নৃসিংহ ॥ বড্ডো বেশী চিনি কিনা তাই। তা, দিন আজ কি কম্পোজ করতে হবে।

পিনাকী ॥ তুমি একটু বসো। আজকের বাজার খরচটা দেখি ধার পাই কিনা কারো কাছে। এক পেয়ালা চা-ও যোটেনি আজ।

[ত্বরিত পদে বাহিরে প্রস্থান। মন্দিরা দরজার আড়ালে ছিল, এবার অফিসঘরে ঢুকিল]

নৃসিংহ ॥ এই যে বৌদি, নমস্কার। আড়াল থেকে শুনছিলেন বুঝি সব? বলুন তো কি লজ্জার কথা।

মন্দিরা ॥ নৃসিংহবাবু, আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নৃসিংহ ॥ অনুরোধ? আমার কাছে? আপনি বলছেন কি বৌদি?

মন্দিরা ॥ হ্যাঁ, আমি নারীসমাজের কাছে একটা আবেদন রচনা করেছি। আমার এই লেখাটি এ অফিসের আর কাউকে না জানিয়ে 'ডমরু'তে ছাপতে হবে আপনাকে।

নৃসিংহ ॥ আপনার স্বামীর কাগজ—আপনি তাঁকে দিচ্ছেন না কেন?

মন্দিরা ॥ আমার এই রচনাটা স্বামীদের শায়েস্তা করবার একটা গোপন সংকেত। তাই কোনো স্বামীর হাতেই আগে দেওয়া চলে না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনি এখনো কারও স্বামী নন, এবং কাজেই আপনি স্ত্রী সম্পর্কে নির্ভয়। এই নিন। (রচনাটি তাহার হাতে দিল) দয়া করে দেখবেন এই শনিবারেই যাতে বেরোয়, স্মল পাইকায় নয়, পাইকা এন্টিকে। আমি আপনাকে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি নৃসিংহবাবু। না না পাচন নয়—পাশের বাড়ী থেকে দুধ চিনি যোগাড় করেছি।

[অন্দরে প্রস্থান]

নৃসিংহ ॥ (রচনাটি চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। শেষ পাতার কয়েকটি লাইন জোরে জোরে না পড়িয়া পারিল না)

"স্বামী অবহেলিত বাংলার অগণিত নারী সমাজের প্রতি এই

আমার শেষ আবেদন, পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের এই বার্ষিক বিবরণটি দংশনরূপ মারণাস্ত্রের যে মূল্যবান ইঙ্গিতটি দিয়াছে তাহা কাজে লাগাইতে হইবে। চুম্বনে স্বামী বশ হয় কিনা জানিনা, তবে দংশনে যে হইবেই, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"—ওরে বাবা! (একজন মাড়োয়ারী পাওনাদার কর্তৃক অনুসরিত পিনাকীর প্রবেশ। তাহাদের পায়ের আওয়াজ পাইয়া নৃসিংহ ভিতরে গিয়া আত্মগোপন করিল)

পাওনাদার॥ না না, আজ হামি কোই বাত না শুনবো এডিটর বাবু। কমসে কমতো দো মাহিনা হো গিয়া দো শো রিম নিউজ প্রিণ্টকা ভাও বাকী রহিয়েসে। এমনি করলে তো হামার গণেশ ভি উল্টে যাবে।

পিনাকী॥ শুনুন রামরাম বাবু, বসুন। আপনি নেপোলিয়নের নাম শুনেছেন, নেপোলিয়ন?

পাওনাদার॥ নেই বাবুজী, কালিনারাণের সাথে হামার কারবার আছে নেপিলনের সাথে নাই।

পিনাকী॥ ও, আপনার নেই? তা না থাক, কিন্তু জেনে রাখুন, খুব বড়ো কারবার ছিলো ওই নেপোলিয়নের। আর এটা জেনে রাখুন ছুনিয়ার ছুটি লোক আজ পর্যন্ত 'না' বলেনি। এক নেপোলিয়ান, ছুই আমি। 'না' আমি বলবো না, তবে এক বিপদ হয়েছে কি জানেন? আমাদের হেড কম্পোজিটার নৃসিংহ সিংহ মানুষ কামড়াচ্ছে। কোনো রকমে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি ওই ঘরে। তাকে পাঠাতে হবে এখুনি আবার পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে চিকিৎসার জন্য।

পাওনাদার॥ এঁ্যা?

পিনাকী॥ হ্যাঁ।

পাওনাদার॥ হাঁ হাঁ। আজ কাগজেই খবরটা নিকলেসে—এগারোটো আদমীকে—

পিনাকী॥ হ্যাঁ কামড়েছে, এবং সে হচ্ছে আমাদের এই হেড কম্পো-

জিটার নৃসিংহ সিংহ। যাদের কামড়েছে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে, কিন্তু যে কামড়াচ্ছে তাকে কেউ ধরতে পারছে না। কারণ জানেন ?

পাওনাদার ॥ এঁ্যা, না তো ? কেনো ?

পিনাকী ॥ দেখতে দেখায় বেশ ভাল মানুষ। ভারি অমায়িক। কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আপনার কাছে। আপনি বললেন রামরাম। সেই ফাঁকে ও সেরে নিল ওর কাম।

[সঙ্গে সঙ্গে হাততালি—এবং প্রায় সাথে সাথেই আড়াল হইতে নৃসিংহের প্রবেশ।]

এই যে, নৃসিংহ কেমন আছো ?

নৃসিংহ ॥ (অমায়িকভাবে পাওনাদারের দিকে অগ্রসর হইল) রামরামবাবু রামরাম।

পাওনাদার ॥ (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতকণ্ঠে) জি রামরাম, এডিটারবাবু হামার জরুরী কাম। হামি চললাম।

পিনাকী ॥ শুনুন, আপনার টাকাটা—

পাওনাদার ॥ ও আপনি যখন সুবিস্তা হবে দিবেন।

[একরূপ পলায়ন করিয়া বাঁচিল]

নৃসিংহ হো হো করিয়া হাসিতেই পিনাকী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। বাহির হইতে মাড়োয়ারী পাওনাদারটির উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা শোনা গেল।)

পাওনাদার ॥ (নেপথ্য হইতে) আরে মোশা অন্দরে কুথা ঘুসছেন, একদম জান চলিয়ে যাবে।

নেপথ্যকণ্ঠ ॥ জান চলিয়া যাবে মানে ? আজ পাওনাটাকা না পেলে কুরুক্ষেত্র করবো।

পাওনাদার ॥ (নেপথ্যে) আরে মোশা জান আগে না রূপিয়া আগে ? আজ কাগজে একটা খবর নিক্‌লালো দেখেন নাই ? একটা আদমী এগারোটা আদমীকো কামড় দে দিয়া।

বহু নেপথ্যকণ্ঠ ।। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি, শুনেছি আজ কাগজে বেরিয়েছে ।

পাওনাদার ।। ও আদমীটা এই ঘরের মধ্যে ঘুসে আছে । উটার নাম নিসিন্‌হ সিন্‌হ আছে ।

নেপথ্যকণ্ঠ ।। সিংহ ?

পাওনাদার ।। হ্যাঁ বাবা সিন্‌হ । মানুষ আজ সিন্‌হ হলো । না হলে বুঝেন না হামি রামরাম আগরওয়ালা, হামি রূপেয়া ছোড়কে পালাচ্ছি । রামরাম, রামরাম—

বহু নেপথ্যকণ্ঠ ।। ওরে বাবা, তাই নাকি ? চলো ভাই চলো, আজ কেটে পড়ো ।

[পাওনাদারদের পলায়নে কোলাহল থামিয়া গেল । এবার ইহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল । এবার অন্দর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল মন্দিরা এবং বাহির হইতে মৃদঙ্গ]

মন্দিরা ।। ব্যাপার কি নৃসিংহ বাবু ?

মৃদঙ্গ ।। ব্যাপার কি পিনাকদা ?

পিনাকী ।। আজকের কাগজের এই মানুষ কামড়ানো খবরটা জোর কাজে লেগে গেছে । রটনা করলাম এই নৃসিংহ সিংহ ভালো মানুষটি সেজে মানুষ কামড়ে বেড়াচ্ছে । যাঁহাতক এই রটনা, সঙ্গে সঙ্গে বাইরের এই ঘটনা । কিন্তু তোমার মুখ শুকনো কেন ?

মৃদঙ্গ ।। তুমি বললে তোমার বিলগুলো শিওর হিট । পাঁচশোর মধ্যে আদায় হলো মাত্র পঞ্চাশ । পুরো একটা শূন্যই বাদ ।

পিনাকী ।। তবে তোমরাও আজ বাদ পড়লে । (টাকাগুলি হাতে লইয়া) এতো এখুনি আমার চাল ডাল কিনতে যাবে ।

মন্দিরা ।। চাল ডাল কিনতে ! ঘুঁটে কয়লা আর কেরোসিনের পাওনাই পঞ্চাশ টাকার বেশী । চুলোও ধরবেনা ওতে আজ ।

নৃসিংহ ।। ও টাকাটা আমাকে দিন । আমার চুলো দু'দিন জ্বলছে না ।

পিনাকী ॥ এতই যখন সয়েছ, আর একটা দিন সয়ে থাকো নৃসিংহ।

নৃসিংহ ॥ কথার খেলাপ করবেন না স্যার।

পিনাকী ॥ আগে এডিটার বাঁচবে তবে তো কম্পোজিটার। কি বলো মৃদঙ্গ ?

[ইতিমধ্যে নৃসিংহ পিনাকী প্রদর্শিত কামড়াইবার টেকনিক অনুযায়ী মুখভঙ্গী করিয়া পিনাকীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছে।]

নৃসিংহ ॥ (বিকৃত কণ্ঠে) আমি কামড়াবো।

পিনাকী ॥ ওরে বাবা। একি। আরে শোনো শোনো—

[কিন্তু নৃসিংহ শুনিল না। সে পিনাকীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে কামড়াইতে গেল। মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া নৃসিংহকে টানিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মৃদঙ্গ টেবিলের তলায় লুকাইয়াছে।]

মন্দিরা ॥ আরে শুনুন শুনুন। আঃ ছাড়ুন।

নৃসিংহ ॥ না, আজ আর আমি ছাড়বো না।

মন্দিরা ॥ (চীৎকার করিয়া) আপনি আমার লেখাটা পড়েননি ? কামড়াবার কথা আপনার নয়, আমার।

নৃসিংহ ॥ ও তাও তো বটে। (পিনাকীকে ছাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিনাকীর উদ্দেশ্যে বলিল) বেঁচে গেলেন স্যার। কারণ কামড়ানোর কপিরাইটটা (মন্দিরাকে দেখাইয়া) ওঁর। নিন এই লেখাটা পড়ুন। (পকেট হইতে লেখাটি বাহির করিয়া পিনাকীর হাতে দিল। পিনাকী চট করিয়া তাহা চোখ বুলাইয়া দেখিল। ইতিমধ্যে মৃদঙ্গ টেবিলের তলা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।)

পিনাকী ॥ ওরে বাবা! (পাঠ) "চুম্বনে স্বামী বশ হয় কিনা জানিনা, তবে দংশনে যে হইবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

মন্দিরা ॥ নৃসিংহবাবু আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, এটা শনিবারে 'ডমরু'তে ছাপা হবে। মনে থাকে যেন।

[অন্দরে চলিয়া গেল]

নৃসিংহ ॥ ছাপবো, আমি ছাপবো। আপনাকে রুখবার ক্ষমতা আজ এডিটারেরও নেই।

পিনাকী ॥ মৃদঙ্গ !

মৃদঙ্গ ॥ দাদা !

পিনাকী ॥ আমি কাগজ তুলে দিলাম। আজ থেকে পিনাকীর 'ডমরু' 'শিঙা হলো। ফোঁকো ভাই ফোঁকো।

॥ যবনিকা ॥

যষ্টি মধু
শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩৬৬

শেষ সংবাদ

(ধনপতি বসু নগরের বিখ্যাত ধনী এবং দেশের প্রখ্যাত নেতা। এই ধনপতি বসু আজ মৃত্যু-শয্যায়। শহরের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ চৌধুরী তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। ধনপতি চিরকুমার। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিশ এবং ভাগিনেয় রমেশ উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে এই কক্ষে উপস্থিত। ধনপতির অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার উকিল-বন্ধু শিবদাস মিত্রও উপস্থিত রহিয়াছেন। শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষারত নার্স তরলা রায়। ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইল। ধনপতির তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা।)

হরিশ ।। কাকাবাবুর আর জ্ঞান আছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

রমেশ ।। কি বুঝছেন ডাঃ চৌধুরী।

ডাক্তার ।। আপনারা ধনপতিবাবুর কে হন ?

হরিশ ।। আমি ওঁর একমাত্র ভাইপো—হরিশ বসু।

রমেশ ।। আমিও ওঁর একমাত্র ভাগনে—স্নেহের রমেশ ঘোষ।

ডাক্তার ।। ধনপতিবাবু চিরকুমার ছিলেন জানি। তবু ভালো, আপনারা আছেন। এবার প্রস্তুত হন।

শিবদাস ।। তার মানে ডাঃ চৌধুরী, আর বুঝি সময় নেই ?

ডাক্তার ।। আপনি কে ?

শিবদাস ।। আমি ওঁর এ্যাটর্ণিবন্ধু শিবদাস মিত্র। একটা উইল করবেন বলে আমায় খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন।

ডাক্তার ।। Perhaps too late আমার তো মনে হচ্ছে সে সময় আর নেই। তবু অপেক্ষা করুন, যদি জ্ঞান ফিরে আসে।

শিবদাস ।। কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি ডাক্তার চৌধুরী ?

ডাক্তার ।। না। আমিও আছি। তবে আমাকে বসবার ঘরে গিয়ে এখনি ওঁর 'হেলথ্-বুলেটিন'টা লিখে সই করতে হবে। একপাল

প্রেস-রিপোর্টার অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আর তাছাড়া, দেখেছেন বোধ হয়—বাড়ীর সামনে কি বিশাল জনতা ওঁর খবরের জন্যে জড়ো হয়েছে।

হরিশ ।। সে এক নুইসেন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রমেশ ।। পুলিশও ভীড় সরাতে পারছে না।

ডাক্তার ।। এটা আপনাদের সৌভাগ্যের কথা। ধনপতি বস্তু শুধু লক্ষপতি নন, দেশের একটা মাথা। আমার দুর্ভাগ্য যে, প্রতীক্ষারত ঐ বিশাল জনতার জন্যে আমি কোনো ভালো খবর নিয়ে যেতে পারছি না।

(ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেলেন)

শিবদাস ।। তাইতো ! এর আগেও ধনপতিবাবু আমাকে দু'একবার বলেছিলেন, উইল করবেন। আমি তখন গা'করিনি। আজ বুঝছি অন্যায় হয়েছে।

হরিশ ।। কাকাবাবু আমাকে এত ভালবাসতেন যে, যখন যা মনে হতো আমাকে বলতেন ; উইলের কথা কিন্তু আমাকে কোনোদিন বলেননি।

রমেশ ।। মামাবাবু কাউকে যা বলতেন না, আমাকে তা বলতেন। আমাকে কিছুদিন আগে একবার ডেকে বলেছিলেন, স্নেহের রমেশ আমার কাছে কি চা'স বাবা, তোকে আমি কি দিতে পারি বল !

শিবদাস ।। আমাকে কিন্তু বলেছিলেন, 'আমার এতবড় বিষয়-সম্পত্তি বারোভূতে লুটে-পুটে না খায়—যাতে দেশের কাজে লাগে এমনি একটা উইলের কথা ভেবে দেখ হে শিবদাস।' কিন্তু দেখছি আমারই গড়িমসীতে—

তরলা ।। মনে হচ্ছে জ্ঞান ফিরে আসছে। (থার্মোমিটারটি বগলের তলা হইতে বাহির করিয়া দেখিয়া) কিন্তু জ্বর এখনো—(হাতের চারিটি অঙ্গুলি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল এক শ'চার)।

ধনপতি ।। (বিকারের ঝোঁকে) আগুন—আগুন—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আমার চারদিকে। (উঠিয়া বসিবার উপক্রম

করিতেই, নার্স তাঁহাকে শোওয়াইতে চেষ্টা করিল) ছাড়ো—ছাড়ো আমাকে পালাতে দাও—

তরলা ॥ আপনারা কেউ ডাক্তার চৌধুরীকে খবর দিন।

শিবদাস ॥ ধনপতি ! ধনপতি ! এই যে ভাই আমি শিবদাস—চিনতে পারছো না ? —আমাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে—উইল করতে—

(ধনপতি শিবদাসের কথা শুনিয়া তাঁহার দিকে বড় বড় চোখে তাকাইয়া রহিয়া খানিকটা শান্ত হইলেন।)

ধনপতি ॥ উইল ! হ্যাঁ—আমি উইল করবো।

হরিশ ॥ কাকাবাবু এই যে আমি আপনার শিবরাত্রির সল্‌তে হরিশ। এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে তো ?

রমেশ ॥ মামাবাবু, আমি আপনার স্নেহের রমেশ—আমায় চিনতে পারছেন তো ?

শিবদাস ॥ আহা, তোমরা থামো। প্রত্যেকটা মিনিট, প্রত্যেকটা সেকেণ্ড এখন মূল্যবান। বরং গিয়ে ডাক্তার চৌধুরীকে ডেকে আনো। (কিন্তু ঐ কথাতে কেহই নড়িল না। শিবদাস কাগজ কলম লইয়া উইল লিখিবার জন্য উদ্যত হইয়া) বলো ভাই ধনপতি, বলো—কি উইল করবে বলো—দেশের কাজে তুমি অনেক টাকা দেবে বলেছিলে —কি দেবে বলো—

ধনপতি ॥ ছাই—ছাই—(অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সকলের দিকে একটিবার তাকাইয়া) আগুনে পুড়ে আমি ছাই হয়ে যাচ্ছি। ওঃ ! ওঃ ! (ভয়ে দুহাতে চোখ ঢাকিয়া) উঃ ! কি পাপ আমি করেছি—কত পাপ আমি করেছি—(শিহরিয়া উঠিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া রহিলেন।)

শিবদাস ॥ ধনপতি ! ধনপতি !

ধনপতি ॥ কে ! কে তুমি ! শিবদাস ! এসেছ ভাই ? আমি উইল করবো। লেখ ভাই, শিগ্‌গির লিখে দাও—আমি সই করবো।

শিবদাস ॥ যাক্। তুমি তবে সজ্ঞানেই রয়েছ ধনপতি। কি লিখবো বলো—

হরিশ ॥ আপনি এ সব কি করছেন শিবদাসবাবু ? ওঁর এখন মানসিক বিশ্রাম দরকার। আপনি কি ওঁকে মেরে ফেলতে চান নাকি ? উইল-টুইল লেখা এখন হবে না।

রমেশ ॥ না-না। মামাবাবুর যখন ইচ্ছে—(মামাবাবুকে) আমি —আপনার স্নেহের রমেশ। আপনি যদি উইল করে আপনার স্নেহের রমেশকে সব দিতে চান কার সাধ্য আপনাকে বাধা দেয় ?

শিবদাস ॥ আঃ! এসব কি হচ্ছে ? জেনো তোমরা, গোটা দেশের লোক ওঁর মুখ চেয়ে রয়েছে—তুমি বল ভাই ধনপতি—দেশের মঙ্গলের জন্যে কাকে কি দেবে ?

ধনপতি ॥ হ্যাঁ—বলছি—বলছি—এখনি বলছি। এরপর আর আমি সময় পাব না। তুমি কলম ধর। ভেজাল সরষের তেলের ব্যবসা করে —জাল ওষুধের ব্যবসা করে আমি লাখ লাখ টাকা কামিয়েছি—

শিবদাস ॥ —তুমি ভুল বকছ ভাই ধনপতি।

ধনপতি ॥ না, না, এই সব ব্যবসা চালিয়ে দেশের কত লোক যে আমি অকালে খুন করেছি, তার লেখা-জোখা নেই। ঐ—তারা সব আমার দিকে রুখে আসছে আমাকে পুড়িয়ে মারতে। চারদিকে আগুন জ্বেলে দিয়েছে আমার—আর সময় আমি পাব না—আমার শেষ কথাটি উইলে লিখে নাও—আমার সব সম্পত্তি আমি দিচ্ছি আমার প্রাণের হরিদাসীকে—ঠীকানা—ঠীকানাটা—আঃ! সেটা এত গোপন রেখেছিলাম যে, আমি নিজেই ভুলে গেছি—উঃ! কি আগুন—কি পাপ—ঐ হরিদাসীর স্বামী ঐ তার ছেলে—ওদের আমি সাবাড় করেছিলাম— এবার ওরা আমাকে—ও হো হো—

(ভয়ে ও আতঙ্কে মুর্চ্ছা। ডাক্তার চৌধুরীর প্রবেশ।)

ডাক্তার ॥ চেঁচাচ্ছিলেন কে ?—একি! (সঙ্গে সঙ্গে রোগীর নাড়ী দেখিয়া) হয়ে গেছে।

হরিশ, রমেশ ও শিবদাস ॥ (প্রায় এক সঙ্গে) বাঁচা গেছে।

॥ যবনিকা ॥

॥ লোক সেবক : পূজা সংখ্যা : বঙ্গাব্দ ১৩৬৫ ॥

মেলাও এবার হাত

[একটি পার্কে বর্ষীয়ানদের সান্ধ্য আসর]

—'সত্যি কথা বলতে কি' আজকালকার কাগজগুলোর কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছে ছিদ্রান্বেষণ। একটা কাগজে দেখলাম, লোকের মুদ্রা-দোষ নিয়ে খুব রসিকতা করা হয়েছে। 'সত্যি কথা বলতে কি' কাগজগুলোও দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে।

—'এর নাম কি, সে হলো গিয়ে' একটু আধটু মুদ্রাদোষ কার না আছে? পরনিন্দাই এখন সকলের 'এর নাম কি সে হলো গিয়ে'—কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

—'বুঝেছ? কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি।' বাঙালী এই দোষেই তো গেল। সেদিন একটা সভায় গিয়ে দেখি—'বুঝেছ? কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি'—খালি পরনিন্দা হচ্ছে। আমি প্রতিবাদ না করে পারলাম না—'বুঝেছ? কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি'—আমাকে তাড়িয়ে দিলো।

—তাড়িয়ে দিয়েছে, ঠিকই করেছে। 'এ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' কথায় কথায় কেবলই যদি তুমি বলো—'বুঝেছ? কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি' তবে আমরাও 'এ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' তোমাকে এখান থেকে দেব তাড়িয়ে। একটু আধটু মুদ্রাদোষ অনেকেরই থাকে কিন্তু তোমার মত মুদ্রাদোষ 'এ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' অসহ্য।

—'বুঝেছ? কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি'। মুদ্রাদোষটি তোমারও কম নয়। মানুষ হলেই, 'বুঝেছ? কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি' —মুদ্রা দোষ থাকবেই।

—হ্যাঁ তা থাকে। তার জন্যে ভুগতেও হয়, যেমন আমি ভুগেছি। রেগে গেলেই আমার মুখ থেকে কেবলই বেরুতে থাকে 'আও মেরি

জান।' তার জন্যে শাস্তিও আমার কম হয়নি। অফিসে বড় সাহেব বিনা দোষে আমাকে একদিন বকাবকি করেছিলো। আমি বললাম 'আও মেরি জান'। সাহেব চটে গিয়ে যত বলে গেট আউট, আমি তত বলি 'আও মেরি জান'। চাকরিটিই আমার চলে গেল।

-কথা বলাও একটা আর্ট—'কি? কি?' কিন্তু এ-ও দেখা উচিত কত কম কথা বলে কত বেশি কাজ করা যায়—'কি? কি?' মুনিঋষিরা বেশির ভাগ সময় থাকতেন মৌন—'কি? কি?' জগতের কত কল্যাণ করেছেন তাঁরা। তাই আমি—'কি? কি?' বুঝি সব তবু চুপ করে থাকি।

-মা বলে গেছেন—'মেলাও এবার হাত'—পরনিন্দা করবি না। তা' না হয় না করলাম কিন্তু নিজের নিন্দা শুনলে আমি সইতে পারিনে 'মেলাও এবার হাত।' সেদিন তো আমার ভায়রাভাইকে এই জন্যেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বললাম 'মেলাও এবার হাত।' আমার বাড়িতে বসে আমাকে অপমান? গিন্নী চটে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। বললাম 'মেলাও এবার হাত'—যাও!

-'সত্যি কথা বলতে কি' কাগজে যে মুদ্রাদোষ নিয়ে নিন্দে করেছে—ঠিকই করেছে। আপনারা যদি 'সত্যিকথা বলতে কি' কথায় কথায় 'আও মেরি জান' আর 'মেলাও এবার হাত' বলেন—লোকে 'সত্যি কথা বলতে কি' হাসবে!

-থাক্ থাক্। 'আপনার' এ সব কথা থাক। আজ সকালে কি হয়েছে জানেন? গিয়েছিলাম 'আপনার' বাজার করতে। 'আপনার' ডিমের দোকানে গিয়ে দেখি সাত আনা করে জোড়া। আচ্ছা বলুন তো 'আপনার' ডিম আমি অত দাম দিয়ে কিনবো কেন? খাবো 'আপনার' মাংস। তাই গেলাম 'আপনার' মাংসের দোকানে। ও, মশাই, গিয়ে দেখি 'আপনার' মাংস একদিকে আর হাড় একদিকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, 'মেলাও এবার হাত'। আজকাল তাই-ই হয়েছে।

—'এর নাম কি, সে হলো গিয়ে' কসাই। আজকাল মশাই সবাই কসাই। কিনলেন আপনি মাংস?

—আরে মশাই, 'আপনার' হাড় আমি তিন টাকা করে কেন কিনবো? আর 'আপনার' ঐ মাংস কুকুরের মাংস কিনা কে জানে? তাই এক ছড়া কাঁচ কলা কিনে নিয়ে চললাম 'আপনার' বাড়ি। 'আপনার' গিন্নী কাঁচ কলা দেখেই আমার ওপর সে কী খুসী!

—না না, 'সত্যি কথা বলতে কি' ওঁরই গিন্নী—আমার নয়।

—'বুঝেছ? কি বুঝেছ? কিচ্ছু বোঝনি' আমি বুঝেছি কার গিন্নী।

—কাঁচ কলার চপ—'কি? কি?' আজ কাল সব বাড়িতেই চলছে। 'কি? কি?' বাঙালী আজ কি খাচ্ছে? কাঁচ কলা খাচ্ছে।

—মা বলেছেন 'মেলাও এবার হাত' কাঁচ কলা খাওয়া ভালো। বিধবারা কি খায়? এক মুঠো আতপ চাল আর 'মেলাও এবার হাত' ঐ কাঁচকলা। তাই স্বাস্থ্যও তাঁদের ভালো থাকে 'মেলাও এবার হাত'—কাঁচ কলা খাও—কাঁচ কলা খাও।

—বাঙালীকে কাঁচ কলা খেতে বলছো তুমি? 'আও মেরি জান'।

—রাখো তোমার 'মেরি জান'। স্বয়ং ডাঃ রায় বাঙালীকে বলেছেন 'মেলাও এবার হাত' কলা খাও।

—হ্যাঁ, ডাঃ রায় আমাদের 'আপনার' কলাই খেতে বলেছেন। এমন দিন আসবে যখন 'আপনার' ডিম জুটবে না, 'আপনার' মাংস জুটবে না, 'আপনার' ডাল-ভাতও জুটবে না। তখন কলাই খেতে হবে 'আপনার'। সেদিন 'আপনার' এসে গেছে।

[তর্ক বাধিল।]

—এ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট · —সত্যি কথা বলতে গেলে · —তার নাম কি সে হলো গিয়ে ·· —কি—কি—··· —কাঁচ কলা খাবার দিন 'আপনার' এসে গেছে। —আও মেরি জান··· —মেলাও এবার হাত। ···—বুঝেছ, কি বুঝেছ, কিচ্ছু বোঝ নি।

॥ যবনিকা ॥

বাণীরূপা—শারদীয় সংখ্যা—বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

দুর্বোধ্য

[একটি পার্কের জনবিরল কোণে একটি বেঞ্চ।
সূর্য ও সন্ধ্যা।]

সন্ধ্যা ॥ এতদিন পর হঠাৎ আবার আমাকে স্মরণ করেছো যে ?

সূর্য ॥ সে তুমি যা-ই বলো, আমি ভাবিনি যে তুমি আসবে !

সন্ধ্যা ॥ তুমি এমনি ক'রে আমাকে আসতে বলায় সত্যিই আমি অবাক হয়েছি কিন্তু !

সূর্য ॥ আমার দুঃসাহস বলতে পারো। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিলো আমি ডাকলে তুমি না এসে পারবে না সন্ধ্যা। বিশেষ এই পার্কে—আমাদের জীবনের অনেক স্মৃতিমাখা এই পার্কে।

সন্ধ্যা ॥ কি বলবে বলো ! তোমার সঙ্গে আমাকে এখানে এভাবে দেখলে লোকে হাসবে। সেটা দুঃসহ।

সূর্য ॥ তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, একথা সত্য ; কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের আইনে এমন কোন বিধান আছে কি যে ভূতপূর্ব স্বামী এবং ভূতপূর্ব স্ত্রী এদের পরস্পরের মুখ দেখা নিষেধ, এমনকি কথা বলাও নিষেধ ?

সন্ধ্যা ॥ না, তা' নেই বটে ; কিন্তু এমন একটা দৃশ্য দেখলে লোকে হাসতে পারবে না– এ বিধানও নেই। কি জন্যে আমাকে ডেকেছো বলো !

সূর্য ॥ নিউইয়র্ক থেকে চন্দ্রা তোমার কলিক্ পেনের একটা ওষুধ পাঠিয়েছে। ওষুধটা নাকি অব্যর্থ। লিখেছে, তার এক বান্ধবী কথায় কথায় তাকে বলেছিলো, এই ওষুধটায় তার কলিক্ পেন একেবারে সেরে গেছে। তখন তার মনে

পড়েছে তোমার কথা। বেচারি এখনো জানে না, তার বৌদি তার দাদাকে ছোড় চলে গেছে।

সন্ধ্যা ॥ জানে না, জানিয়ে দাও। সেই সঙ্গে ওষুধটাও ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

সূর্য ॥ কলিক্ পেনটা তবে তোমার সেরে গেছে?

সন্ধ্যা ॥ তোমার এ প্রশ্নের এখন আর কোনো মানে হয় না। আমি সেরে গেছি কি মরেছি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না কি?

সূর্য ॥ কেন?

সন্ধ্যা ॥ পরস্ত্রীর জন্যে এই দরদ তোমার নিজের স্ত্রী সইবেন না। এর চেয়ে আর একটু বাড়াবাড়ি হলে এ-স্ত্রীও তোমার যাবে।

সূর্য ॥ সব স্ত্রী-ই তোমার মত নয়।

সন্ধ্যা ॥ জানি না। নিজের কথাটাই জানি। আমাকে লুকিয়ে রমলাকে অত দরদ দেখিয়েছিলে, সেটা আমি সইতে পারিনি একথা সত্য। তাও যতদূর সহ্য করা সম্ভব, করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে, আমার কলিক্ পেনের চেয়ে রমলার ব্লাডপ্রেসারটাই তোমার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ালো, তখনই তোমার ঐ ব্যাভিচারটা আর সইতে পারলাম না। সেটা যে ব্যাভিচার সেকথা শুধু আমি বলিনি, আদালতে রমলার স্বামীও হলফ্ করেই বলেছিলেন।

সূর্য ॥ রমেনটা মানুষ নাকি? একটা ব্রুট। স্ত্রীর চিকিৎসা দূরে থাক, তাকে মার ধোর ক'রে তার গয়না ছিনিয়ে নিয়ে খেতো। পাশের ফ্ল্যাটে এই অঘটন রাতের পর রাত ঘটছিলো—সইতে পারিনি সেটা। আর তুমিও আমাকে তাই সইতে পারলে না। যাক্ গে সে কথা। কিন্তু একি, তুমি অমন করছো যে!

সন্ধ্যা ॥ (যন্ত্রণায় বিবর্ণ হইয়া) আমার সেই কলিক্ পেনটা—উঁঃ! আঃ!

সূর্য ॥ (পকেট হইতে পিল জাতীয় একটা ওষুধের ফাইল বাহির

করিয়া তাহা হইতে একটি পিল লইয়া) হাঁ করো তো—হাঁ করো—হাঁ করো—(সন্ধ্যা হাঁ করিলে পিলটি তাহার মুখে ফেলিয়া দিয়া) চিবিয়ে খাও—হ্যাঁ হ্যাঁ, গিলে ফেলো।… ব্যাথাটা একটু কমেছে কি ?…হ্যাঁ, মনে হচ্ছে একটু কমেছে। কমতেই হবে। চন্দ্রা লিখেছে ওষুধটা ম্যাজিকের মত কাজ করে। মনে হচ্ছে কথাটা মিথ্যে নয়।…ব্যথাটা গেছে, কেমন ?

সন্ধ্যা॥ (শান্তভাবে) অনেক ধন্যবাদ। চলি।

সূর্য॥ ওষুধের শিশিটা নিয়ে যাও !

সন্ধ্যা॥ না, থাক।

সূর্য॥ চন্দ্রা লিখেছে, রাতে ঘুমোবার আগে রোজ একটা পিল খেতে। তবে নাকি কলিক্ পেন আর হবেই না।

সন্ধ্যা॥ তুমি যে আজ আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছো, আমার জন্যে ওষুধ এনেছো, রমলা তা জানে ?

সূর্য॥ নিশ্চয়।

সন্ধ্যা॥ হুঁ।

সূর্য॥ কি ভাবছো ?

সন্ধ্যা॥ আমি চলি।

সূর্য॥ ওষুধটা নাও—নিয়ে যাও।

সন্ধ্যা॥ না।

সূর্য॥ না ! কেন সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা॥ একদিন আমি ছিলাম তোমার—তুমি ছিলে আমার। কিন্তু আজ আর তা নয়। এখানে যে আমাকে দয়া করতে এসেছো সেটাও রমলার দয়া।

সূর্য॥ তুমি বলছো কি সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা॥ কেন যেন কেবলি মনে হচ্ছে চুপি চুপি এসে চোরের মত যদি ঐ অমৃতটা আমার হাতে তুলে দিতে, আমি নিতাম।

সূর্য॥ সে কি ?

সন্ধ্যা ॥ হ্যাঁ, তবেই মনে হতো তোমার জীবনে আমি এখনো বেঁচে আছি। না-না, সব শেষ। আমি চললাম।

সূর্য ॥ সন্ধ্যা, শোনো—

সন্ধ্যা ॥ বলো।···কেন তুমি আমাকে এমন করে ডাকছো? কেন ভুলে যাচ্ছো, আর আমি তোমার নই, তোমার নই—। তুমি তোমার স্ত্রীকে জানিয়ে আমার জন্যে ওষুধ নিয়ে এসেছো। আমি আমার স্বামীকে গিয়ে বলছি, সে ওষুধ আমি নিইনি—নিইনি।

(সন্ধ্যা চলিয়া গেল)

সূর্য ॥ এরা যে সব কী, আজো বুঝলাম না।

॥ যবনিকা ॥

মধুরাংশ্চ

শারদীয়া সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

কুকুর
বেড়াল

[বিখ্যাত এ্যাডভোকেট গম্ভীরানন্দ মিত্রের চেম্বার। শ্রীযুক্ত মিত্র একটি ফাইল পাঠরত। চেম্বারের পরদা সরাইয়া একটি মহিলা দেখা দিলেন।]

মহিলা ॥ আসতে পারি ?

[মিত্র আসিতে ইঙ্গিত করিলে অতি আধুনিক একটি তরুণী উদভ্রান্ত ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন]

তরুণী ॥ আমি বড় বিপন্ন শ্রীযুক্ত মিত্র ! স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আমি জানি এ বিষয়ে আপনার চেয়ে বড় উকিল আর নেই বললে হয়, কিন্তু তাতেই হয়েছে বিপদ। আমার স্বামীকেও দেখলাম আপনার এই চেম্বারের দিকে আসছেন। কিন্তু আমি এসেছি আগে। আশা করি আপনি আমাকেই সাহায্য করবেন। আমি আপনাকে আপনার পূরো ফি একশ টাকাই দেব।

[চেম্বারের দরজায় স্বামীর কণ্ঠও শোনা গেল]

স্বামী ॥ আসতে পারি স্যার ?

[শ্রীযুক্ত মিত্র এই অনুমতি যাহাতে না দেন তাহার জন্য স্ত্রী হাত নাড়িয়া ব্যাকুল মিনতি জানাইলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মিত্র তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।]

স্বামী ॥ আসবো স্যার ?

[অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মিত্র অঙ্গুলী নির্দেশে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

স্বামীটি স্ত্রীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া চেয়ারে বেশ গ্যাঁট হইয়া বসিলেন]

স্ত্রী ॥ (স্বামীকে) তুমি ভেবেছ কি ? তুমি এখানেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে নাকি ?

স্বামী ॥ আমি জানি, শ্রীযুক্ত মিত্র বিবাহ বিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় উকিল। তুমি যে ওঁর কাছে এসে আমার নামে কতকগুলো মিথ্যে কথা লাগিয়ে ওঁর মন গলিয়ে দেবে—আমার বিরুদ্ধে ও'র মন বিষিয়ে দেবে—এ আমি হতে দেব না।

স্ত্রী ॥ (মিত্রকে) আমি আগে এসেছি। আমি আপনাকে পুরো ফী দেব। আশা করি আপনি আমার কথাই শুনবেন শ্রীযুক্ত মিত্র।

মিত্র ॥ (মৃদু হাস্য।)

স্বামী ॥ (মিত্রকে) আমিও আপনাকে আপনার পুরো ফী একশ টাকাই দেব, আমার কথাও আপনাকে শুনতে হবে স্যার।

মিত্র ॥ (এবারও মৃদু হাস্য।)

স্ত্রী ॥ লোকটি কেমন জুলুমবাজ, আশা করি আপনি এতেই বুঝে গেছেন শ্রীযুক্ত মিত্র। দরকার হ'লে লোকটি খুনও করতে পারে, এও আপনাকে বলে রাখছি স্যার।

স্বামী ॥ বিনা দরকারেই তুমি আমাকে প্রায় খুন করেছো। কি বলবো স্যার, একটা জ্বলন্ত চিমটা দিয়ে আমাকে পুড়িয়েছে।

স্ত্রী ॥ তুমি একটা জ্বলন্ত সিগারেট আমার হাতের ওপর ঠেসে ধরেছিলে ! তাই না আমি নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ঐ জ্বলন্ত চিমটা দিয়ে তোমাকে ঠেঙিয়ে আত্মরক্ষা করেছি। নইলে কি কেউ সাধ করে স্বামীর গায়ে হাত তোলে।

স্বামী ॥ স্যার আপনিই বুঝে দেখুন, কেউ কি সাধ করে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে ? আদরের স্ত্রীর গায়ে ? যখন দেখলাম, না, আর উপায় নেই, তখনি না আমি—

স্ত্রী ॥ উপায় ছিল না—একথা ধর্মতঃ বলতে পারো তুমি? ঐ বাঘা কুকুরটা তোমার না পুষলে কি কিছুতেই চলতো না?

স্বামী ॥ আমি তোমাকে বিয়ের আগে বলেছি, বিয়ের পরেও বলেছি, দেখ, আমি সব সইতে পারি কিন্তু বেড়ালের 'ম্যাঁও ম্যাঁও' ডাক সইতে পারিনে। তবু কিনা তুমি সেই বেড়ালই পুষলে—গণ্ডায় গণ্ডায়?

স্ত্রী ॥ লোকে হাতি পোষে, বানর পোষে, আর আমি স্ত্রী বলে আমার কি এটুকুও স্বাধীনতা নেই যে আমি একটা বেড়াল পুষবো? বেড়াল পুষেছি, বেশ করেছি।

স্বামী ॥ ঐ বেড়াল তাড়াতে আমিও বাঘা কুকুর পুষেছি—বেশ করেছি।

স্ত্রী ॥ বেশ করেছো? বেশ, আমিও তাই তোমাকে চাবির রিং ছুঁড়ে মেরে কোনো অন্যায় করিনি।

স্বামী ॥ আর তাই আমিও তোমার গায়ে এক বালতি গরম জল ঢেলে দিয়ে কোনো অন্যায় করিনি।

স্ত্রী ॥ (মিত্রকে) আপনি শুনেছেন স্যার?

মিত্র ॥ ('মাথা নাড়িয়া জানাইলেন হ্যাঁ')।

স্বামী ॥ আশা করি আপনি আমার কথাগুলোও শুনেছেন।

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইলেন হ্যাঁ')।

স্ত্রী ॥ এই লোকটির এই সব অত্যাচারে আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তিন মাস।

স্বামী ॥ হ্যাঁ। নিজের খরচে নয়, আমার খরচে। আর তোমারও ঐসব অত্যাচারে আমাকেও হাসপাতালে থাকতে হয়েছে পুরো তিনমাস। তার খরচ তুমি দাওনি—সে খরচও বইতে হয়েছে আমাকে।

স্ত্রী ॥ এই তিনটি মাস হাসপাতালে পড়ে থাকায় আমার যে কী নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে তা, তুমি জানো?

স্বামী ॥ তোমার আবার কি নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে? নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে আমার। হাসপাতাল থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি আমার

বাঘা নেই। তার বক্‌লসটাই শুধু পড়ে আছে। বেচারি আমার শোকে তিলে তিলে কাঠ হয়ে মারা গেছে।

স্ত্রী ॥ আর আমার? আমার ক্ষতি হয়নি? হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমার ধাড়িটা গেছে পালিয়ে, বাচ্ছাগুলো সঙ্গে নিয়ে। (ক্রন্দন)

স্বামী ॥ আর আমার বাঘাটা? তার লাশটা পর্যন্ত আমি দেখতে পেলাম না। (ফুঁপাইয়া ক্রন্দন)

স্ত্রী ॥ (ধরা গলায়) এ কি! পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি ভেউ ভেউ করে কাঁদছো? স্যার কি মনে করেছেন বল তো? না না, শোনো, তুমি কেঁদো না! আমি সব সইতে পারি—তোমার কান্না সইতে পারিনে। তুমি কাঁদলে আমার কান্না পায়। তুমি কেঁদোনা। বেশ, বেড়াল আর আমি পুষবো না, পুষবো না।

স্বামী ॥ তুমি বিড়াল না পুষলে, আমারো কুকুর পোষার কোনো মানে হয় না। বেড়াল যদি না থাকে কুকুরও থাকবে না।

স্ত্রী ॥ তবে তো ঝগড়া-ঝাঁটির আর কোনো কারণই থাকে না। (মিত্রকে) আপনি কি বলেন স্যার?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।)

স্বামী ॥ তবে তো বিবাহ বিচ্ছেদের কথাই উঠছে না। কি বলেন স্যার?

মিত্র ॥ (মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।)

স্ত্রী ॥ তাহ'লে আমরা আর এখানে কেন? কি বল গো?

স্বামী ॥ তা তো বটেই। চলো—বাড়ি চলো।

স্ত্রী ॥ (স্বামীকে হাসিমুখে) তাহলে এখন থেকে আমাদের—কুকুর-হীন জীবন—

স্বামী ॥ এবং বেড়াল-হীন জীবন, কেমন তাইতো?

স্ত্রী ॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়! এখন শুধু তুমি আর আমি।

স্বামী ॥ হ্যাঁ, আমি আর তুমি। কুকুর-বেড়াল ভুলে গিয়ে—

স্ত্রী ॥ একমন একপ্রাণ হয়ে—(অনুরাগ ভরে স্বামীর হাত ধরিতে গেলেন ।)

স্বামী ॥ আঃ ! দেখছো না, স্যার—

স্ত্রী ॥ ওঃ ! (সংযত হইয়া) আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা আসি ।

মিত্র ॥ (সস্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন) ।

স্বামী ॥ চললাম স্যার ।

[মিত্র সস্মিত মুখে সম্মতি জানাইলেন । স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নমস্কার করিয়া যাইতেছেন । এমন সময় শ্রীযুক্ত মিত্র টেবিলে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া হুংকার দিয়া হাত পাতিলেন । স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চমকাইয়া উঠিলেন]

স্ত্রী । ও ! তাইতো ! ফি ! ১০০৲ টাকা ! (পার্স খুলিয়া টেবিলের উপর ১০০৲ টাকা রাখিলেন)

স্বামী ॥ বটেই তো । (মানি ব্যাগ হইতে ফী'র টাকা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রাখিলেন) ।

উভয়ে ॥ [স্বামী ও স্ত্রীর মুখ বাঙলা পাঁচ-এর আকার ধারণ করিল] আচ্ছা চলি !

মিত্র ॥ [নোটগুলি গুণিতে লাগিলেন]

॥ যবনিকা ॥

নতুন খবর

শারদীয়া সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

চিত্রাঙ্গদা

॥ ললিতা ॥

কতকাল পর কালিম্পং এলি। তুই আমাদের একেবারে ভুলেই গিয়েছিলি মিত্রা!

॥ মিত্রা ॥

যদি ভুলেই যাবো, তবে এসেই তোকে ডেকে আনবো কেন ললিতা!

॥ ললিতা ॥

অবাক হয়েছি তাতে। সত্যি এতটা আশা করিনি। তুই এখন জঁাদরেল একটা মিলিটারী অফিসারের বৌ। কত বদলে গেছিস্ তুই।

॥ মিত্রা ॥

কি আবার বদলালাম?

॥ ললিতা ॥

বদ্লাসনি? তোকে আগে যারা জানতো না, তাদের চোখে হয়তো ধরা পড়বে না সেটা। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখছি আমাদের সে মিত্রা আর নেই।

॥ মিত্রা ॥

বদলাবার জন্যেই তো মানুষ। জীবনে কত ঢেউ আসছে। ঠিক থাকবো কি করে ললিতা? তুই আমার সাজ-সজ্জা দেখে হয়তো চমকে উঠেছিস।

॥ ললিতা ॥

হ্যাঁ। তা চমকে গেছি। তুই না পরতিস খদ্দরের শাড়ী? একটা পান খেতেও কোনদিন দেখিনি তোকে। আজ দেখছি লিপ্‌স্টিক! আর এ পোষাকে তোর বাবার সামনে বেরিয়েছিস নাকি?

॥ মিত্রা ॥

কি করবো বল্! স্বামী যদি এই সবই চায়, স্ত্রীর উপায় কি? বিয়ে করিসনি বলেই স্বামী কি 'চিজ' বুঝিসনি আজও।

॥ ললিতা ॥

আমি তোর বাবার কথা ভাবছি। একমাত্র সন্তান তোকে যে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিলেন—তার লক্ষণ কিন্তু এবার তোর মাঝে দেখছি না—অন্ততঃ বেশভূষায় আর প্রসাধনে। তিনি কিছু বলেন নি ?

॥ মিত্রা ॥

ক্ষমা বাবার ভূষণ। আর তা ছাড়া, তিনি এখানে নেই। কালিম্পং থেকে গ্যাংটকের পথে কোন্ এক খুব বড় তিব্বতী সাধু আশ্রম করেছেন, আজ মাস দুই বাবা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে আছেন।

॥ ললিতা ॥

তা, ভালোই হয়েছে।

॥ মিত্রা ॥

হ্যাঁ, তা ভালোই হয়েছে। তুই ভাবছিস, বাবা আজ আমাকে দেখলে আঁতকে উঠতেন। কিন্তু আমার স্বামীটিকে দেখলে হয়তো তাঁর হার্ট ফেলই হ'তো।

॥ ললিতা ॥

তিনিও এসেছেন নাকি ? ক্যাপ্টেন সেন এখানে ?

॥ মিত্রা ॥

না, না, তোর ভয় নেই। এখনো তিনি আসেননি। তবে হ্যাঁ, আজ তাঁর আসবার কথা। এখনো কেন এসে পৌঁছুলেন না তাই ভাবছি। তিব্বতের লাসা কি এখান থেকে এতদূর !

॥ ললিতা ॥

ক্যাপ্টেন সেন তিব্বতে গেছেন ?

॥ মিত্রা ॥

হ্যাঁ, দিন পনেরো আগে কলকাতা থেকে উড়ে গেছেন সেখানে। মিলিটারী ডিউটি। আজ তাঁর কালিম্পং আসবার কথা—জীপে। আমি বলে দিয়েছিলাম—ফেরবার সময় কালিম্পংয়ে শ্বশুরবাড়িটা দেখে এসো। দেখেননি কোনোদিন—না শ্বশুর, না শ্বশুরবাড়ি।

॥ ললিতা ॥

তোর বরকে দেখতে খুব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তোর কথাতে ভয় পাচ্ছি যে। খুব ড্রিঙ্ক করেন বুঝি ?

॥ মিত্রা ॥

লোকটি ভারি আশ্চর্য। যতক্ষণ মনের আনন্দে আছে, এক ফোঁটাও মদ খাবে না সে। গ্লাসও ছোঁবে না। কিন্তু মনে যদি দুঃখ এলো তবে আর রক্ষে নেই।

॥ ললিতা ॥

তাই নাকি? খুব ইন্টারেস্টিং তো। তবে ভরসা এই, তাঁর দুঃখের কোনো কারণ হয়তো হয়ই না—তোর জন্যে।

॥ মিত্রা ॥

না, না, ললিতা। এ কথা বলা চলে না। জীবনটা কোনো ধরা-বাঁধা ছক নয়। একজন যাতে আনন্দ পায়, আর একজন পায় তাতে দুঃখ। তাছাড়া মানুষের রুচি হরদম বদলাচ্ছে। আজ যেটা ভালো লাগে কাল সেটা লাগে না।

॥ ললিতা ॥

আধুনিক সমাজ-জীবনে আমার মনে হয় এইটেই সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আজ তোকে মনের কথা খুলে বলেছি মিত্রা। এই ভয়েই আমি বিয়ে করিনি এতদিন।

॥ মিত্রা ॥

তুই বেঁচে গেছিস ললিতা—তুই বেঁচে গেছিস। জীপের শব্দ শুনছিস কি?

॥ ললিতা ॥

হ্যাঁ। নিশ্চয় ক্যাপ্টেন সেন।

॥ মিত্রা ॥

হয়তো।

॥ ললিতা ॥

আমি ভাই পালাই।

॥ মিত্রা ॥

কেন, পালাবি কেন?

॥ ললিতা ॥

না না ভাই, আনন্দে আছেন কি দুঃখে আছেন, কে জানে? কাল সকালে যদি আনন্দে থাকেন তবে খবর দিস। আসবো।

॥ মিত্রা ॥

এ কি! পালিয়ে গেলি যে!

॥ ক্যাপ্টেন সেন ॥

অল্পের জন্যে কলিশনটা হয়নি। ···তুমিই তো চিত্রা?

॥ মিত্রা ॥

আসুন—বসুন।

॥ সেন ॥

আশ্চর্য! মিত্রা বলেছিলো বটে যে দেখলে ভুল হবে। না বলে দিলে সত্যিই ভুল হতো চিত্রা।

॥ মিত্রা ॥

আমরা যমজ বোন বলে এ ভুল অনেকেই করে। হ্যাঁ, জানেন ক্যাপ্টেন সেন, ঐ আমাদের বিপদ। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

॥ সেন ॥

সে কষ্ট আমার সার্থক। এখন ভাবছি তোমার দিদি কেন তোমাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন। হ্যাঁ, তা বলবো, নইলে কেন তোমাকে নেন নি কলকাতায় আমার সামনে!

॥ মিত্রা ॥

না, তা বলবেন না। তা যদি হতো তবে এবারও আপনাকে আসতে বলতেন না এখানে। দিদি জানেন, আপনার জন্যে তাঁর কোন ভয়ের কারণ নেই। আমার জন্যেও না। আরাম করে বসুন। (কলিংবেল টিপিতেই বাহাদুর ছুটিয়া আসিল) চা। আপনি ক'টায় ডিনার খান ক্যাপ্টেন সেন?

॥ সেন ॥

তোমার দিদির হুকুম 'Dinner at eight'! কিন্তু আজ কোনো নিয়মে বাঁধা পড়তে মন চাইছে না এখানে।

॥ মিত্রা ॥

ডিনার রেডি করে গরম রেখো বাহাদুর। এখন চা। [বাহাদুরের প্রস্থান] দিদি লিখেছেন, 'দেখিস কোনো অযত্ন না হয়।' স্নান করবেন কি ? গরম জল রয়েছে।

॥ সেন ॥

না, এই ঠাণ্ডায় স্নান না। ···তুমি মিত্রাকে দিদি বলো কেন চিত্রা ?

॥ মিত্রা ॥

দিদি আমার চেয়ে এক ঘণ্টা আগে পৃথিবীর আলো দেখেছিলো ক্যাপ্টেন সেন ! আর তাই হয়তো আমার চেয়ে ওর রূপের ছটাটা বেশি !

॥ সেন ॥

Absurd ! তুমি ওকে আজকাল দেখনি। আলোটা ফিকে হয়ে গেছে ওর। ও যেন অস্ত যাচ্ছে। তোমাকে দেখছি মূর্তিমতী উষা।

॥ মিত্রা ॥

সন্ধ্যায় দেখছেন উষা ? আপনি কবি না কি ক্যাপ্টেন সেন ?

॥ সেন ॥

এমন একটি শ্যালিকা পেলে কে না কবি হয় চিত্রা ? ভালো কথা, শ্বশুর মশাইকে দেখছি না তো ? শুনেছি তিনি খুব বুড়ো।

॥ মিত্রা ॥

তিনি আজ কিছুদিন থেকে এখানে নেই। গ্যাংটকের পথে এক সাধুর আশ্রমে বাস করছেন।

॥ সেন ॥

That's good। আশ্রমে থাকা ভালো। সরে থাকা ভালো। বাড়িতে আর কে আছে চিত্রা ?

॥ মিত্রা ॥

বাড়িতে আমি একা।

॥ সেন ॥

That's awfully good! একা থাকায় যে কি আনন্দ কোনো ঝামেলা নেই। তুমি একা আছো চিত্রা? চমৎকার।

॥ মিত্রা ॥

না না, একা নেই।

॥ সেন ॥

ও, ঐ বাহাদুর রয়েছে। ওকেও মানুষ বলে ধরো নাকি?

॥ মিত্রা ॥

না না, বাহাদুর ছাড়াও লোক রয়েছে এ বাড়িতে।

॥ সেন ॥

কে?

॥ মিত্রা ॥

আপনি!

॥ সেন ॥

(হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) আমি? আরে, আমি তো তোমার আপনার লোক। নই কি?

॥ মিত্রা ॥

আপনি দিদির লোক।

॥ সেন ॥

আমাব গায়ে কিন্তু সেটা লেখা নেই।

॥ মিত্রা ॥

কিন্তু মনে তো লেখা রয়েছে।

॥ সেন ॥

সেটাও আর খুঁজে পাই না। বোধ হয় মুছে গেছে।

॥ মিত্রা ॥

কিন্তু মুছেই বা যাবে কেন? জীবনের ঐ দলিলটা যেদিন রেজিষ্ট্রী করেছিলেন, সেদিন, ওটা কোনোদিন মুছে যাবে এ কথা ছিলো না কিন্তু।

॥ সেন ॥

তবে তোমাকে বলি চিত্রা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল

তোমার ঐ দিদি। তাকে দেখেই আমি ভুলেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই অ-স্থরের জীবনে পেলাম আমি স্থরের বীণা। বাজাতে গিয়ে দেখি বাজে না, বাজে না।

॥ মিত্রা ॥

যন্ত্র যদি না বাজে সেটা যন্ত্রীরই দোষ। কারণ যন্ত্রটা সে দেখেই নিয়েছিলো হাতে। না না, নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ দেবেন না।

॥ সেন ॥

তোমার সাথে কথায় পারবো বলে মনে হচ্ছে না চিত্রা। তাই এক কথাতেই বলা ভালো, তোমার দিদিটি মানুষ নয়। একটি স্ট্যাচু। তুমি তাকে ভেনাস বলো, আপত্তি করবো না আমি। শুধু বলবো, ভেনাসের স্ট্যাচু। ওতে প্রাণ নেই। যে প্রাণের স্পন্দন জ্বলজ্বল করছে তোমার মধ্যে। আমি চাই জীবনের উদ্দামতা। কিন্তু ও হচ্ছে মৃত্যুর প্রশান্তি।

॥ মিত্রা ॥

দিদি আমাকে লিখেছিল, আপনি একটা ঝড়। আপনাকে শান্ত করবার শক্তি পায় না সে। আর যা লিখেছিল তা বলতে আমি শিউরে উঠছি। (হাসিয়া) বলবো ?

॥ সেন ॥

তোমার ঐ হাসিটা খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে। নিশ্চয় বলবে।

॥ মিত্রা ॥

কিন্তু বলতে আমার ভয় হচ্ছে।

॥ সেন ॥

কিন্তু তোমার চোখে দেখছি কৌতুক। বলো আর কি লিখেছে ?

॥ মিত্রা ॥

আঃ ! হাতটা ছাড়ুন।

॥ সেন ॥

না বললে ছাড়বো না।

॥ মিত্রা ॥

লিখেছিলো, বিধাতা ওঁকে পাঠিয়েছিলেন তোর জন্য। আমার কাছে এসেছে ভুলে।

॥ সেন ॥

(আবেগে) চিত্রা! তোমাকে আজ দেখা মাত্র এই একটি কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছে চিত্রা!

॥ মিত্রা ॥

কিন্তু দিদির চিঠিতে জেনেছি, আপনাকে জয় করবার আশা এখনো সে ছাড়েনি। আপনার জীবনের ঝড় যখন থেমে যাবে তখনই সে আপনাকে পাবে, এই আশায় সে বসে আছে!

॥ সেন ॥

তবে তাকে বৈধব্যের জন্য অপেক্ষা করতে বলো চিত্রা। আর তুমি এসো আমার জীবনে। আমার জীবনের জীপে উঠে পড়ো চিত্রা।

॥ মিত্রা ॥

কলঙ্কের ভয় রাখেন না আপনি?

॥ সেন ॥

কলঙ্ক আছে বলেই না ঐ চাঁদ এত সুন্দর। সেই যৌবনই যৌবন, যা কলঙ্কের ভয় রাখে না—যা বেপরোয়া।

॥ মিত্রা ॥

মানি। কিন্তু বেপরোয়া জীবনে আমাদের দুজনের বাঁধন যদি খসে যায়? যদি আমি ছুটে চলে যাই আর কোনোখানে? ভালো যদি লাগে আমার অন্য কোনো জীবন? সইতে পারবেন আপনি সেটা?

॥ সেন ॥

হুঁ, বুঝেছি। তোমার দিদি বলেন একনিষ্ঠ প্রেমের কথা। কিন্তু চিত্রা, জীবনটা অনেক বড়ো। মানুষের মন, বড়ো তার চেয়েও। কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়া মানেই জীবনটাকে ছোট করা। মনটাকে ছোট করা। তাই নয় কি চিত্রা?

॥ মিত্রা ॥

হুঁ।

॥ সেন ॥

চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

॥ বাহাদুর ॥

চা।

॥ সেন ॥

থাক্ চা। বাইরে উঠেছে জ্যোৎস্না। ঐ জানালা দিয়ে দেখ কাঞ্চনজঙ্ঘা। চলো বেরিয়ে পড়ি। তুমি ওভারকোটটা নাও। কী ভাবছো ?

॥ মিত্রা ॥

ভাবছি অনেক কিছু। ভাবছি দিদি আপনাকে পেলো না—পেলাম কিনা আমি। মনে পড়ছে আজ চিত্রাঙ্গদার কথা।

॥ সেন ॥

চিত্রাঙ্গদা ? সে আবার কে ?

॥ মিত্রা ॥

পুরাণের গল্প। সে ছিলো রাজকন্যা। সবই ছিল তার, কিন্তু ছিলো না তার রূপ—যা দিয়ে অর্জুনের মতো বীরকে জয় করতে পারে।

॥ সেন ॥

চত্রাঙ্গদা নাটকটা নিউ এম্পায়ারে দেখেছি। প্রেমের ডালি নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু অর্জুন দিয়েছিলো তাড়িয়ে। দেবে না ? অর্জুনও ছিলো মিলিটারী। তাকে জয় করতে হলে চাই রূপের উদ্দামতা। যা তোমার আছে।

॥ মিত্রা ॥

পরে কিন্তু কঠোর তপস্যা করে, শিবের বরে, বিশ্বজয়ী অর্জুনকে জয় করবার রূপই পেয়েছিলো চিত্রাঙ্গদা।

॥ সেন ॥

হ্যাঁ, আর তখনই অর্জুন তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলো চিত্রা।

॥ মিত্রা ॥

হ্যাঁ, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তখন ভাবলো, যাকে অর্জুন বুকে নিলো সে তো আমি নই, আমি নই।

॥ সেন ॥

কিন্তু নাটকটা বিশ টাকার টিকিট কিনে ফার্স্ট রো থেকে আমি পুরোপুরিই দেখেছি। শেষটায় অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিয়েই হয়েছিলো। একদিন আমাদেরও হবে। আমাদেরও হবে। আমি জীপটা বের করছি। তুমি এসো।

॥ মিত্রা ॥

বাহাত্বর !

॥ বাহাত্বর ॥

কী দিদিমণি ?

॥ মিত্রা ॥

দরজাটা বন্ধ করে দে।

॥ বাহাত্বর ॥

কেন সাহেব আর আসবেন না ?

॥ মিত্রা ॥

না।

* * * *

॥ সেন ॥

এ কি, দরজা বন্ধ কেন ? চিত্রা, চিত্রা, চিত্রা ! দরজা বন্ধ কেন, দরজা খোল।

॥ মিত্রা ॥

না। তুমি যাকে চাইছ সে আমি নই। আমি ছলনা। এ জয় আমার জয় নয়, পরাজয়। তুমি চলে যাও। তুমি চলে যাও।

॥ যবনিকা ॥

চিত্রাঙ্গদা
প্রথম বর্ষ ঃ
প্রথম শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

অ-মৃত

মেয়েটি ॥ এর পর আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

ছেলেটি ॥ আমারও না।

মেয়েটি ॥ শুনি মরবার সময় শেষ নিঃশ্বাসে মানুষ যে কামনা করে পরজন্মে না কি তা পূর্ণ হয়। বিশ্বাস হয় তোমার?

ছেলেটি ॥ ওই একটি বিশ্বাসই আমার এখন আছে। আর সব গেছে।

মেয়েটি ॥ কী দোষ করেছি আমরা? দু'জন দু'জনকে ভালোবেসেছি—বিয়ে করতে চাইছি। সংসারের সমাজের এই তো নিয়ম।

ছেলেটি ॥ ব্যতিক্রম হচ্ছে শুধু আমাদের বেলায়। বাবা এত অবুঝ হবেন, এ আমি কখনো ভাবিনি ছায়া।

মেয়েটি ॥ আমার বাবাও যে এতো অবুঝ হবেন, এও তো আমি ভাবিনি আলো।

ছেলেটি ॥ বিয়েটা আমাদের হতো কিন্তু বিধাতার কী বিধান দেখো। পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করি। এতকাল আমাদের দুটি পরিবারে এত মিলমিশ। তবু হঠাৎ এমন একটা লড়াই বেধে গেলো।

মেয়েটি ॥ তোমার বাবার নাকি ভেজাল ওষুধের ব্যবসা।

ছেলেটি ॥ বাবা বলেন, না। তিনি বলেন, এটা তোমার বাবার মিথ্যে রটনা। মিথ্যে একটা গোলোযোগ সৃষ্টি করে পুলিশ বিভাগে তাঁর প্রমোশন নেবার চেষ্টা।

মেয়েটি ॥ বাবা আগে বেশ ছিলেন। পুলিসের এই দুর্নীতি দমন বিভাগে বদলী হবার পর থেকেই বাবার এখন সবাইকে

সন্দেহ। আগেতো কতবার তোমাদের বাড়ী এসেছি, দু'জনে পালিয়ে গিয়ে কত সিনেমা থিয়েটার দেখেছি, বাবা কখনো দেখেও দেখেন নি। কিন্তু এখন তাঁর কড়া চোখ আমার উপর।

ছেলেটি ॥ আমার উপরেও। বাবার উপরে তো আছেই। বাবা বলেন, ও নগেনটা আমার শত্রু।

মেয়েটি ॥ আমার বাবা বলেন, মহেশটা সমাজের শত্রু।

ছেলেটি ॥ এ হলো গিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই—আমরা দু'টি উলুখড়, মরছি আমরা।

মেয়েটি ॥ চুপ! কারা যেন এ দিকে আসছে। তোমার এ ঘরে আসবে না তো?

ছেলেটি ॥ দরজায় খিল অাঁটা আছে। জানালাটাও বন্ধ করে দিচ্ছি।

[আস্তে আস্তে জানালাটা বন্ধ কবিযা দিল—উভযে উৎকর্ণ হইযা বাহিরের কথা শুনিতে লাগিল।]

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ না-না গিন্নি। নগেনকে আজ আমি মুখের উপর স্পষ্ট বলে দিয়েছি, ফের যদি সে আমার বাড়ীতে আসে, তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে লাথি মেবে তাড়িয়ে দেবো। আর তোমাকেও বলে রাখছি, তার সেই ধিঙ্গি মেয়েটা যদি আবার এ বাড়ীতে আসে, তাকে ধবে তার মাথা ন্যাড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে দেবো। আমার সে হতভাগাটা কোথায়? তাকেও আমি আজ শেষ বার বলে দেবো সে যদি আবার ওই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়, তাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করবো। কোথায় গেলো হতভাগা?

বাহিরে ছেলেটির মা ॥ ঘরেই আছে।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ ঘরের দবজা বন্ধ কেন? খোল হতভাগা খোল।

বাহিরে ছেলেটির মা ॥ না না তুমি মারধোর কোরোনা।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ খবরদার গিন্নী ! তুমি এতে এসো না। যা করবার আমিই করছি।

মেয়েটি ॥ না—না এর পর আর বাঁচা চলেনা অলো।

ছেলেটি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ ছায়া।

মেয়েটি ॥ তোমার সেই 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' কোথায় আলো ? বের করো। বের করো।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ একী ! ঘরের ভিতর একটা মেয়ের গলা শুনছি। তবে সেই হারামজাদী।

বাহিরে ছেলেটির মা ॥ ওগো এবারটি মাপ করো। এবারটি মাপ করো।

বাহিরে ছেলেটির বাবা ॥ খবরদার গিন্নী ! তুমি এতে এসো না।

খোল, খোল দরজা, নইলে দরজা আমি ভেঙে ফেলবো।

[দরজায় ক্রমাগত করাঘাত।]

মেয়েটি ॥ এই তোমার সেই পটাসিয়াম সায়ানাইড ?

ছেলেটি ॥ হ্যাঁ ছায়া। মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তুজনে চলে যাবো জীবনের পরপারে।

মেয়েটি ॥ এসো আমার পাশে এসে বসো। দরজা ভাঙবার আগেই যেন—

ছেলেটি ॥ বিধাতা, পরজন্মে যেন আমাদের বিয়ে হয় নিষ্কণ্টকে।

মেয়েটি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মরবার সময় শেষ নিঃশ্বাসে এই কামনা নিয়েই আমরা মরছি। পূর্ণ হয় যেন আমাদের কামনা পরজন্মে।

[ছেলেটি এবং মেয়েটি পরস্পরে বাঁ হাতে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে দিলো। দরজায় প্রবল করাঘাত।]

মেয়েটি ॥ আলো, আমার আলো।

ছেলেটি ॥ ছায়া, আমার ছায়া।

মেয়েটি ॥ আমরা কী এখনো বেঁচে আছি ?

ছেলেটি ॥ বোধ হয় না।

[দরজা ভাঙিয়া গিয়াছে। ছেলের বাপ একং মা এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।]

ছেলেটির বাবা ॥ এ কি!

ছেলেটির মা ॥ এ কি, ওদের কি হয়েছে।

ছেলেটি ॥ আমরা বিষ খেয়েছি। পটাসিয়াম সায়ানাইড।

ছেলেটির বাবা ॥ পটাসিয়াম সায়ানাইড! আরে হতভাগা পেলি কোথায়?

ছেলেটি ॥ তোমার কারখানায়।

ছেলেটির মা ॥ সর্বনাশ।

ছেলেটির বাবা ॥ আঃ থামো গিন্নি। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছে বলে সর্বনাশ নয়। ওটা যে ভেজাল, কথাটা নগেন জানলে সর্বনাশ। ওঠো বাবা ওঠো, ওঠো ওঠো মা ওঠো। একটা গাড়ী নিয়ে সোজা চলে যাও দু'জনে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে। কাজটা সেরে এসো। শুধু একটা মিনতি মা, নগেনটা যেন না জানে আমার কারখানার পটাসিয়াম সায়ানাইডও ভেজাল!

মেয়েটি ॥ আমরা তবে মরিনি?

ছেলেটির বাবা ॥ না না মা মরনি। কিন্তু আমাকে তোমরা মেরোনা। মনে রেখো মা, তুমিও এখন আমাদের 'পার্টনার'।

॥ যবনিকা ॥

মধুরাংশ্চ
শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩৬৬

সুনয়নী

রূপক নাট্য

—কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

—আমাদেরই মতো আর কোনো হতভাগা হয়তো আসছে।

—আমাদেরই মতো ও বেচারীও হয়তো কতো আশা নিয়ে এই দুর্গম স্থানে এসে পৌঁছেছে।

—কিন্তু ও যে আমাদেরই মতো অন্ধ তা তোমরা কি করে ভাবছো ?

—নইলে এখানে কেউ আসে ?

—হ্যাঁ, এই দুর্গম পথ ধরে—ভিক্ষে করতে করতে—

—প্রাণের মায়া ছেড়ে, পাহাড়ী পথে হোঁচট খেতে খেতে ?

—লোকের হাত-পা ধরে পথের সন্ধান জানতে জানতে ?

—শুধু অন্ধ লোকই এভাবে এখানে আসবে চোখ ফিরে পাবে এই আশায়।

—হ্যাঁ, তা ঠিকই বলছো। যাদের চোখ আছে তারা কখনো এ কষ্ট সহ্য করবে না।

—তাদের দায় পড়েছে!

—কাজেই যার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি অন্ধ না হয়ে সে যায় না।

—তোমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। আমি অন্ধ।

—মেয়েছেলে!

—হ্যাঁ আমি মেয়েছেলে। তোমরা বলতে পারো এ আমি কোথায় এসেছি ?

—তুমি কোথায় যাবে বলে বেরিয়েছিলে গো ?

—এটা কি সূর্যসাধুর গুপ্ত গুহা ?

—তোমরা আর কেউ কথা বোলো না। এ মেয়েটির সঙ্গে আমাকে আলাপ করতে দাও।

—কেন ? তুমি বা একাই আলাপ করবে কেন ?

—এই দ্যাখো, আর কেউ আলাপ করবে না আমি কি তাই বলছি ? আগে আমাকে আলাপ করতে দাও—মানে মেয়েটিকে বাজিয়ে দেখতে দাও।

—বাজিয়ে দেখার আবার কি আছে ?

—হ্যাঁ, বরং তবলা বাজিও। কিন্তু বাবা, মেয়েছেলে বাজিও না।

—কী বিপদ, তোমরা থামবে ? বাজিয়ে দেখার নেই ? ও বলছে বটে অন্ধ, কিন্তু ও যে অন্ধ তার কী প্রমাণ তোমরা পেয়েছো ?

[নিস্তব্ধতা]

—আমি অন্ধ আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না ?

—বিশ্বাস ? খানিকটা বিশ্বাস হচ্ছে এই জন্যে যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আশাতে এক শুধু অন্ধই এখানে আসবে, এতো দুঃখকষ্ট সয়ে।

—কেন, আমি যে অন্ধ আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না ?

—নাঃ, এরপর আর কোনো সন্দেহ নেই।

—কিন্তু আমার সন্দেহ তো এখনো যাচ্ছে না। আমি কি সত্যি সত্যিই সূর্যসাধুর গুপ্ত গুহায় আসতে পেরেছি।

—হ্যাঁ, তা পেরেছো।

—ও, তবে তোমরাও সবাই অন্ধ।

—কি করে বুঝলে ?

—আমি শুনে এসেছি যে, অন্ধ ছাড়া এখানে কেউ আসে না। আসতে পারে না।

—শুনেছো ? আর কি শুনেছো ?

—শুনেছি, এখানে এই গুপ্ত গুহায় যে সাধুটি থাকেন, তার নাম সূর্যসাধু।

—ঠিকই শুনেছো।

—আর কি শুনেছো ?

—শুনেছি, চন্দ্রগ্রহণের রাতে তিনি আবির্ভূত হন তাঁর এই গুপ্ত গুহায়।

—হ্যাঁ, আমরাও তাই শুনেছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরাও তো তাই জীবনপণ করে এখানে এসেছি।

—হ্যাঁ, তাঁর দয়ায় দৃষ্টি ফিরে পাবো এই আশাতেই এতো দুঃখকষ্ট সয়েও এখানে পড়ে আছি।

—কিন্তু শুনেছি প্রতি চন্দ্রগ্রহণে তিনি একটিমাত্র অন্ধকেই দৃষ্টিদান করেন। এ কথা কি সত্যি?

[নিস্তব্ধতা]

—আপনারা চুপ করে রইলেন যে? বলুন না একথা কি সত্যি?

—হ্যাঁ, আমরাও তাই শুনেছি।

—আপনারা ঠিক কি শুনেছেন বলুন না?

—চন্দ্রগ্রহণের রাতে সূর্যসাধু কোনো একটি অন্ধকে দান করেন দিব্যদৃষ্টি।

—আমি জেনে এসেছি আজই সেই চন্দ্রগ্রহণের রাত।

—এ্যাঁ?

—তাই নাকি?

—আজ চন্দ্রগ্রহণ?

—ওগো মেয়ে শুনছো? আজই যে চন্দ্রগ্রহণ এ তুমি কি করে জানলে?

—যাত্রীরা সব অলকনন্দায় গ্রহণের স্নান করতে এসেছে যে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে আজই। আমরাও মনে মনে আঁচ করছিলাম—আজকালের মধ্যেই গ্রহণ লাগবে। কিন্তু কখন যে ওঠে সূর্য আর কখন যে যায় অস্ত···সে নিয়েও আমাদের মধ্যে এতো মতভেদ যে দিন-ক্ষণের খেই ফেলেছি আমরা হারিয়ে।

—ভাগ্যিস তুমি মেয়ে এসেছিলে! তাই সঠিক জানতে পারছি আজই সেই চন্দ্রগ্রহণ। আ—দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ আজ।

—আশা-নিরাশার লড়াইও হবে আজ শেষ।

—আমাদের মধ্যে কেউ একজন আজ সূর্যসাধুর কৃপায় লাভ করবে দিব্যদৃষ্টি।

—কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান ?

—অথবা কে সেই ভাগ্যবতী ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিও যখন সময় মতো এসে পড়েছে, সাধুর দয়া কে লাভ করবে প্রশ্নটা আরো জটিল হয়ে উঠছে।

—তা হোক। সূর্যসাধু শুনেছি অন্তর্যামী। দৃষ্টি ফিরে পাওয়া যার সবচেয়ে বেশী দরকার তিনি সেটা জানেন। হ্যাঁ, তাকেই করবেন কৃপা। এ বিশ্বাস আমার আছে।

—কিন্তু তোমরা জানো না দৃষ্টি ফিরে পাওয়া আমার কতো দরকার।

—আমার সব কাহিনী শুনলে সে দরকার যে আমারই সবচেয়ে বেশী এ তোমরাই বলবে।

—কার কি কাহিনী সে তো আমরা সবাই জানি।

—হ্যাঁ, নতুন করে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ কি ?

—কিন্তু নতুন লোক এখানে একজন এসেছে। ঐ মেয়েটি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর কোনো কথাই তো আমরা জানি না।

—আমিও আপনাদের কোনো কাহিনীই জানি না। তাতে হয়েছে কি ? চোখ হারিয়ে কার কতটা দুঃখ শুনে কি সুখ ?

—না না। এতো দুঃখের কথা শুনেছি আর এতো দুঃখ পেয়েছি যে দুঃখের কথা আর শুনতে ভালো লাগে না—ভালো লাগে না আমার। তুমি মেয়ে কোনো আনন্দের কথা শোনাতে পারো আমাদের ? কি নামে তোমাকে আমরা ডাকবো বলো না।

—নাম ছিলো আমার সুনয়নী। ডাকবেন আমাকে ঐ নামে, আপনারা ?

—না না। ওতে তোমাকে আঘাত করাই হবে, মেয়ে।

—না না, তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনে আমরা।

—আমাদের এই জীবনের অন্ধকার আকাশে তুমি যেন শুকতারাটি হয়ে জ্বলছো। বাইরের চোখে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না সত্যি কিন্তু মনের চোখে আমি তোমায় দেখছি।

—এমনি সব কষ্ট কল্পনা আমি সইতে পারি না। শুকতারা না

হাতী। কালো কুৎসিৎই বোধ করি হবে ওই মেয়েটা। যৌবনও হয়তো গেছে। তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমার ভালো লাগছে না।

—না না, দাঁড়াও না। বলো না মেয়ে কতো তোমার বয়স ?

—না না এসব প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি।

—না না আমরা তোমার বয়স জানতে চাইনে মেয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা ধরে নিচ্ছি চির-যৌবনবতী ঐ শুকতারা তুমি।

—হায় হায়, শুকতারা আমি দেখিনি। জন্ম থেকেই অন্ধ আমি।

—আচ্ছা এখন দিন না রাত ?

—ও হ্যাঁ, তাই তো ঐ মেয়েটি এসে আমাদের আসল প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে।

—কি প্রশ্ন ?

—চন্দ্রগ্রহণের আর কতো বাকী ? এটা দিন না রাত ?

—তাই তো, যে জন্য আমাদের এখানে আসা, সেই কথাটাই আমরা ভুলে গিয়েছি।

—সূর্যসাধুর কথাই ভুলে গিয়েছি।

—তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। আশানিরাশার লড়াই থেকে ক্ষণিকের মুক্তি পেয়েছিলাম আমরা।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন একটা মধুর স্বপ্ন দেখছিলাম আমরা। স্বপ্নটা ভেঙে গেলো। চন্দ্রগ্রহণের কথা চুলোয় যাক। এখন খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

—ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো হে। দারুণ ক্ষিদে বোধ হচ্ছে।

—আমারও।

—আমারও।

—কিন্তু শুনুন, খেতে হলে এখনই খেতে হবে। গ্রহণ লাগলে তো আর খাওয়া চলবে না।

—যা বলেছো। কিন্তু খাবার তো সেই ফলমূল। যেতে হবে গুহার বাইরে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে হবে ফলের গাছ। যাবে ?

—না না না। লগ্ন পেরিয়ে যাবে। গ্রহণের লগ্ন পেরিয়ে যাবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একথা খুবই ঠিক। কিন্তু পেটে কিছু না দিলেও তো চলছে না আমার। বেশী ক্ষিদে পেলেই আমার ওঠে শূলবেদনা। এখন আমি কোথায় পাই খাবার ?

—বেশ কিছু খাবার ছিলো আমার ভিক্ষের ঝুলিতে। অলকনন্দায় স্নান করতে যাচ্ছিল যে যাত্রিদল তারা দিয়েছিলো আমাকে। কতো রকম সব ভালো খাবার। সেইসঙ্গে ভিক্ষেও মিলেছে বেশ কিছু টাকাপয়সা।

—বা-বা-বা! তারই কিছু খাবার ভিক্ষে দাও না আমাকে। দাও না গো।

—আমাকেও দয়া করো গো মেয়ে। খেতে না পেলে ওর হয় শূলবেদনা আর আমার শুরু হয় বমি।

—তবে শোনো মেয়ে, আমার কথাও শোনো। খিদের জ্বালা সইতে পারি না বলেই আমার হতভাগী মা আমাকে শিশুকালেই দিয়েছিলো বিক্রি করে ভিখিরীদের এক দালালের কাছে। ওষুধ দিয়ে তারাই আমার চোখদুটির মাথা খেয়েছে। অন্ধ ভিখিরী বেশী ভিক্ষে পায় জানতো ?

—নাঃ শূলবেদনাটা আর চাপতে পারছি না।

—সর সর। আমার গা গুলোচ্ছে। আমি বমি করবো।

—ওগো মেয়ে, দাওনা তোমার ভিক্ষের ঝুলিটা আমাদের ভিক্ষে।

—আমার ভিক্ষের ঝুলিটা রেখে এসেছি গুহায় ঢুকবার দরজায়। ভেতরে ওটা আনবার নিয়ম নেই বলেই শুনেছি যে।

—তুমি ঠিকই শুনেছো।

—বেশ, আমরা গুহার দরজাতেই যাচ্ছি।

—যাচ্ছেন যান। না বলবো না। কিন্তু গ্রহণ যদি এখুনি লেগে যায় তখন ?

—আরে, আমরা এই যাবো আর আসবো।

—কিন্তু দেখবেন গ্রহণ লাগলে যেন আর কিছু খাবেন না।

—তাইতো, গ্রহণ কখন লাগবে তা জানবো কি করে ?

—এখনি যে লাগেনি, তাই বা কে বললে ?

—না না। লাগেনি, গ্রহণ লাগেনি। অলকনন্দার যাত্রীরা আমায় বলেছে গ্রহণ লাগলেই তারা শাঁক বাজাবে।

—বাঁচালে মেয়ে, বাঁচালে। চলো চলো, সবাই চলো।

—হ্যাঁ,হ্যাঁ, আর দেরী কোরো না। কখন শাঁক বেজে উঠবে কে জানে বাবা।

* * *

—মনে হচ্ছে কে যেন রয়ে গেছে।

—হ্যাঁ আমি।

—কে আপনি ?

—সেই অন্ধ। যার শুকতারা তুমি।

—আপনার বুঝি ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই ?

—ক্ষুধা নেই। কিন্তু তৃষ্ণা আছে।

—কথাটা কেমন হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে।

—কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যটাই তোমাকে আমি বলেছি স্থনয়নী।

—আপনি না একটু আগে বলেছিলেন স্থনয়নী বললে আমাকে আঘাতই করা হবে।

—তখন এই কথাটাই বড়ো বেশী মনে হয়েছিলো যার নয়নতুটি গেছে, তাকেই বলছি স্থনয়নী। কিন্তু এখন যে একথা কিছুতেই মনে করতে পারছি না যে তোমার নয়ন নেই। আমার মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কী অপরূপ তোমার চোখতুটি।

—যে চোখতুটি আমার একেবারেই নেই।

—তুমি ভুল করছো স্থনয়নী। দেহে যে তুটি চোখ থাকে সেই চোখতুটি মানুষের একমাত্র চোখ নয়। মানুষের সত্যিকার চোখ থাকে মনে। আমি তোমার সেই চোখতুটির কথাই বলছি স্থনয়নী।

—কিন্তু তার পরিচয়ই বা আপনি পেলেন কোথায় ? এ সব আপনার মনগড়া কথা। এ আপনার কষ্ট কল্পনা।

—ভিক্ষুক হয়েও ক্ষুধার্তকে ভিক্ষা দিয়েছে কে ? আমি না তুমি ?

—ও। কিন্তু তাতে আমার মহত্বটা কি ? ভিক্ষের ঝুলিটা আমার একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই সেটা ওদের দিতে আমার এতটুকু বাধেনি। কিন্তু আপনাকে তো আমি কিছুই দিইনি। তবে কেন এই গুণগান ?

—ক্ষুধার্ত নই বলেই আমি যাইনি। তৃষ্ণার্ত বলেই আমি রয়ে গেছি।

—কিসের তৃষ্ণা আপনার ?

—রূপের।

—আপনি না অন্ধ ?

—হ্যাঁ। অন্ধ বলেই আমার তৃষ্ণার শেষ নেই। আমার বাসনা, আমার কামনা, আমার কল্পনা আমার মনের চোখের সামনে এতোকাল গড়ে তুলেছে যে অনুপমা নারী, আমার সেই অরূপরতন প্রিয়া মনে হচ্ছে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—জীবনে এই প্রথম শুনছি সেইসব কথা যা শোনবার জন্য সব নারী জন্ম থেকেই তপস্যা করে। কিন্তু জেনে রাখো অন্ধ, আজ যদি তুমি চোখ পাও ফিরে, ফিরেও তাকাবে না আমার দিকে।

—তাই, তুমিও শুনে অবাক হবে নারী, চোখ আমি চাই না।

—সে কি !

—হ্যাঁ স্থনয়নী। হ্যাঁ।

—চোখ তুমি ফিরে চাওনা ?

—না। চাই না। তোমাকে দেখবো না বলেই চাই না।

—তবে কেন এই কৃচ্ছসাধন করে এসেছিলে এখানে ?

—এসেছিলাম দিব্যদৃষ্টি লাভের আশায়। আশা আমার অসার্থক হয়নি প্রিয়া। আমি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ। যাচ্ছি। আমি যা চেয়েছিলাম, আমি তা পেয়েছি।

—কি তুমি পেয়েছ তুমিই জানো। কিন্তু আমি? আমি কি করবো?

—তুমি কি করবে সে জানো তুমি। আমি জানি না!

—দাঁড়াও। সেই কথাটা কি তুমি আর একবার আমাকে শোনাবে যা আমার এই বাইশটি শীতের জীবনে প্রথম দিয়েছে বসন্তের দোলা।

—শুধু একবার কেন, চিরদিন বলবো, চিরকাল বলবো, বারবার বলবো।

—আজ মনে হচ্ছে আমি সেই নারী, অন্ধ হলেও যে ছিলো সম্রাজ্ঞী! [হাসিয়া] ইতিহাসের পাতায় আছে নাকি এমন কোনো নারী?

—জানি না।

—ইতিহাস কতোটুকু জানে? জানে না যে সে নারী আমি। চলো।

—সে কি? তুমি চলে যাবে? দিব্যদৃষ্টির শুভলগ্ন যে এসে গেছে। এখনি যদি গ্রহণের শাঁখ বেজে ওঠে, এই গুপ্ত গুহায় থাকছো একাকী তুমি। সূর্যসাধুর বরে তোমারই হবে জয়। না না তুমি থাকো। যেতে দাও আমাকে।

—দিব্যদৃষ্টি আমি পেয়ে গেছি। দেখছি তুমি বৃদ্ধ নও। তুমি প্রৌঢ় নও। জরাজীর্ণ অন্ধও তুমি নও। ছিন্নবসন ভিক্ষুকও নও তুমি।

—তবে? কে আমি?

—তুমি সম্রাট। আমার সম্রাট। চলো, চলো। শাঁখ বাজবার আগে ডেকে দিয়ে যাই যারা অন্ধ।

—তুমি আমি তবে অন্ধ নই!

—না। না। না।

[অদূরে শঙ্খধ্বনি]

—কিন্তু ঐ যে শাঁখ বাজছে সুনয়নী।

—হ্যাঁ, বাজছে। তোমার আমার নবজীবনের জয়ধ্বনি শুনছি।

—শাঁখ বাজছে। চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে শুরু।

—শুরু হলে শাঁখ বাজে, শেষ হলেও বাজে। ওদের হ'ল শুরু, আমাদের হ'ল শেষ। হ্যাঁ চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে আমাদের।

—এ গুহা থেকে তবে বেরিয়ে পড়ো সুনয়নী। বাইরের জীবন-জ্যোৎস্না আমাদের ডাকছে।

—আমার হাত ধরো সম্রাট। অলকনন্দায় আমরাও করবো স্নান।

—হ্যাঁ, মুক্তিস্নান। সূর্যসাধু আমাদের প্রণাম নিয়ো।

—সূর্যসাধু, আমাদের এই দুঃখের জীবনে এই সুখের আলো যেন অস্ত যায় না কখনো।

[গুহাটি দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান। পশ্চাৎপটে শঙ্খধ্বনিরত এক জ্যোতির্ময় পুরুষের বরাভয় মূর্তির আভাস। ধীরে যবনিকা নামিতে লাগিল।]

॥ যবনিকা ॥

বেতার জগৎ
শারদীয়া সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭

গৃহরাজ্য

[অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ মহানন্দ মিত্রের বাসভবনে বসিবার ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল। টেবিলের দুইপার্শ্বে কিছু চেয়ার। মহানন্দ একটি সোফায় বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছেন। ভৃত্য ভূতনাথ করজোড়ে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ভূতনাথ॥ চিঠি পেলাম বৌয়ের অবস্থা এখন তখন। কিছু টাকা নিয়ে দেশে ছুটতে হচ্ছে আমাকে এখুনি। ছুটি চাই, সেই সঙ্গে কিছু টাকাও চাই কর্তা।

মহানন্দ॥ কর্তা? কর্তা আবার কে?

ভূতনাথ॥ ও, হ্যাঁ, স্যার। আমাকে দয়া করুন স্যার।

মহানন্দ॥ সে সব দিন আর নেই ভূতনাথ। জানতো এ বাড়ীর বিধি ব্যবস্থা এখন সংবিধানে শাসিত। এজন্য প্রথমে তোমাকে দরখাস্ত করতে হবে হোম্‌সেক্রেটারীর কাছে। তিনি তোমার দরখাস্ত পাঠাবেন এস্টাব্লিশমেণ্ট সেক্‌সনে। তারা দেখবে তোমার ছুটি পাওনা আছে কিনা। ক্যাজুয়াল লিভ, আরন্‌ডলিভ এসব এ্যাকাউণ্ট দেখা হবে। তারপর, তুমি যখন কিছু টাকাও চাইছ, তখন কেসটা ফিনান্সকেও দেখাতে হবে।

ভূতনাথ॥ কিন্তু অত সব দেখাতে গেলে, স্যার আমি আমার মর-মর বউকে গিয়ে দেখতে পাবনা।

মহানন্দ॥ বউকেই যদি দেখতে না পাও, তবে ছুটি নিয়ে লাভ?

ভূতনাথ॥ এখন তো তাই দেখতে পাচ্ছি স্যার। দেখি আমাদের ইউনিয়নের সংগে পরামর্শ ক'রে দেখি।

মহানন্দ॥ ও বাবা, তোদেরও আবার ইউনিয়ন হ'য়েছে নাকি?

ভূতনাথ॥ তা একটা হ'য়েছে স্যার।

মহানন্দ॥ কিন্তু, সেটা আমরা এখনও রেকোগ্নাইজ করিনি।

ভূতনাথ ॥ করেন নি, কিন্তু করতে 'হবে স্যার।

মহানন্দ ॥ সে দেখবো। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট দরখাস্ত দিক।

ভূতনাথ ॥ আজ্ঞে আমি তার প্রেসিডেণ্ট।

মহানন্দ ॥ ওরে বাবা, তাই নাকি? আচ্ছা তোর সংগে আমি প্রাইভেট্ কথাবার্তা কইবো এখন। ওইযে, আমার এক বন্ধু দেখা করতে আসছেন—পরাক্রম সান্যাল। এসেই চা চাইবে। দু'নম্বর চা আনবি।

ভূতনাথ ॥ দু'ম্বর মানে, চা আর বিস্কুট।

মহানন্দ ॥ না, চা আর মুড়ি। ফিনান্স নতুন সার্কুলারে দু'ম্বর চায়ে বিস্কুট কে'টে মুড়ি করেছে। আর এক নম্বর চাতে সিঙ্গারা আর রাজভোগের যায়গায় শুধু ক্যাজুনাটস্ করেছে।

(পরাক্রম সান্যালের প্রবেশ)

মহানন্দ ॥ আরে এস এস, পরাক্রম এস। তোমার কথাই ভাবছিলাম। ভালো আছ তো?

পরাক্রম ॥ তা আছি। কিন্তু, গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু চা।

মহানন্দ ॥ (ভূতনাথ কে) হ্যাঁ হ্যাঁ চা। (দুইটি অঙ্গুলি ভূতনাথকে দেখাইলেন) বুঝেছিস?

ভূতনাথ ॥ হ্যাঁ স্যার।

[ভূতনাথের প্রস্থান]

মহানন্দ ॥ তার পর পরাক্রম, এখন কী আন্দোলন চালাচ্ছো?

পরাক্রম ॥ আইন অমান্য আন্দোলনের কথাই ভাবছি।

মহানন্দ ॥ সে কি হে? আইন অমান্য আন্দোলন!

পরাক্রম ॥ হ্যাঁ দাদা, আইন অমান্য আন্দোলন।

মহানন্দ ॥ কোন আইন?

পরাক্রম ॥ সব আইন।

মহানন্দ ॥ সে কি হে? আইন না থাকলে সমাজ চলবে কি ক'রে?

পরাক্রম ॥ ভেবে দেখ ভাই, আইন থাকলেই বুঝতে হবে সমাজের

স্টাণ্ডার্ডটা নীচু ; সে সমাজে অনেক গলদ। যে সমাজে আইন নেই, বুঝতে হবে, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, মানে, পারফেক্ট।

মহানন্দ ।। তা আমাদের সমাজ কি পারফেক্ট ?

পরাক্রম ।। এখন নয় বটে, কিন্তু, সব আইন উঠে গেলে ধীরে ধীরে আপনা আপনি সমাজ পারফেকসনে এসে যাবে। কিন্তু আইন চালু থাকলে, সমাজের সে বিশুদ্ধ অবস্থা কোনদিনই আসবেনা। এই যে চা এসে গেছে !

[দুই নম্বর চা লইয়া ভূতনাথের প্রবেশ]

পরাক্রম ।। কিন্তু, মুড়ি কেন ?

ভূতনাথ ।। আজ্ঞে বিস্কুট বাড়ন্ত।

[ভূতনাথের প্রস্থান]

মহানন্দ ।। (হাসিয়া) মানে, ডেফিসিট বাজেট চলছে আরকি ! কিন্তু আইন সব তুলে দিলে, সমাজ পারফেকসনে আসবে, এ কথা তুমি কি করে বল।

পরাক্রম ।। একসপেরিমেণ্ট করে তাই দেখা গেছে। বিলেতে অনেক যায়গায় হকাররা পথের ধারে খবরের কাগজ রেখে চ'লে যায়। দিনের শেষে এসে দেখে, সব কাগজ বিক্রি হয়ে গেছে, আর তার দামও রেখে গেছে ক্রেতারা। ফাঁকি দেয় নি কেউ। তবেই দেখ ভাই—

মহানন্দ ।। তুমি হাসালে।

পরাক্রম ।। আজ হাসছো, হাসো, কিন্তু, একদিন দেখবে এ আন্দোলন চলছে আর জিতেও গেছে। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে তিনিই এ আন্দোলনটাকে চরম রূপ দিয়ে যেতেন। তিনি নেই কাজেই আইনঅমান্যআন্দোলনটাকে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে এখন আমাদের। রাতদিন এখন আমি এই সবই ভাবছি।

মহানন্দ ।। তা ভাবো। আমাদের পার্লামেণ্টের জরুরী অধিবেশনের সময় হ'য়ে এল। তুমি এবার এস।

পরাক্রম ।। পার্লামেণ্ট ? ও তোমার হোম-পার্লামেণ্ট ? তোমার সেই পাগলামিটা এখনো আছে নাকি ?

মহানন্দ ॥ পাগলামি বলছ কি হে ? যখন চাকরিতে ছিলাম তখন আমার সংসারটা ছিলো অরাজক। সাবজজের চাকরি। বাইরের লোকের বিষয় সম্পত্তির মামলা নিষ্পত্তি করতে হ'তো আমাকে। রাতদিন আদালতের নথির মধ্যে ডুবে থাকতে হ'তো। নিজের ঘরের দিকে তাকাবার অবকাশ ছিলো না। গিন্নি আর ছেলেমেয়েরা খুশি মতো খরচপত্র করতেন। মাসের দশ দিন যেতে না যেতেই কত রকমের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতো! তখন একেবারে হাবুডুবু খেতে হ'তো।

পরাক্রম ॥ ঘরে-ঘরেই এ অবস্থা।

মহানন্দ ॥ কিন্তু পেনসন নেবার পর আমি এটা চেক করেছি। চেক না করে উপায়ই বা কী বলো। আয় তো অর্ধেক হয়ে গেছে।

পরাক্রম ॥ বটেই তো। তবু তো তোমার পেনসন আছে। আমার তো কোনো ফিক্সড্ ইন্‌কামই নেই। ম্যানেজ করা যে কী কষ্ট সে আর কী বলবো।

মহানন্দ ॥ তা তো বটেই। কিন্তু ভাই, কী করে ম্যানেজ করছো ?

পরাক্রম ॥ ইজ্‌ম্ দিয়ে।

মহানন্দ ॥ ইজ্‌ম্ ?

পরাক্রম ॥ হ্যাঁ, ইজ্‌ম্।

মহানন্দ ॥ কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

পরাক্রম ॥ তুমি আমার পরম বন্ধু বলেই সিক্রেটটা তোমাকে বলছি। কিন্তু দেখো, কথাটা চাউর করে দিয়োনা যেন।

মহানন্দ ॥ আরে না, না। তুমি বলো।

পরাক্রম ॥ তাহলে শোনো। মাসের প্রথম সপ্তাহে হাতে কিছু টাকা আসে। মানে, পাওনা-টাওনাগুলো কিছু পাই।

মহানন্দ ॥ তা তো পাবেই। মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পেয়েই তো লোকে দেনা শোধ করে।

পরাক্রম ॥ হ্যাঁ। আর তাতেই তখন আমার হাতে কিছু টাকা আসে। আর তাই মন মেজাজটাও বেশ ভালো থাকে। মাসের ওই প্রথম

সপ্তাহটাতেই আমি ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ফলো করি। ট্যাক্সিতে চাপি—কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে, কোনো বন্ধুবান্ধবের চোখে পড়ি না। তা যাক গে, তখন দু-চার পয়সা দানধ্যানও করি; ছেলেমেয়েদের সিনেমা-থিয়েটার দেখার পয়সাও মঞ্জুর করি; খোস মেজাজে নিজে বাজার করি; ভালো খাইদাই। মানে, মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ক্যাপিটালিস্ট এবং দস্তুর মতো খানদানী মানুষ।

মহানন্দ ॥ আর দ্বিতীয় সপ্তাহে ?

পরাক্রম ॥ তখন টাকাপয়সার টান পড়ে; অবস্থাটাও নরম হয়ে আসে।

মহানন্দ ॥ তখন সোশ্যালিজ্‌ম্ ?

পরাক্রম ॥ এই তো ঠিক ধরেছো, দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি সোশ্যালিস্ট। উঁচু-নিচু ভেদাভেদ মানি না। পাওনাদার টাকা চাইতে এলে বলি: আরে দাঁড়ান মশাই, আপনার না হয় দুপয়সা আছে, আমার না হয় নেই। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেতে নতুন সমাজে আমাদের সুযোগ-সুবিধে পেতে দিন। মনে রাখবেন, এটা সাম্যের যুগ। আমার নেই, আর আপনার আছে বলেই যে আপনি আমাকে চোখ রাঙাবেন, তা আর চলবে না।

মহানন্দ ॥ এমনি করে কলা দেখিয়ে দাও। বাঃ ! এ তো বেশ।

পরাক্রম ॥ হ্যাঁ।

মহানন্দ ॥ আর তৃতীয় সপ্তাহে ?

পরাক্রম ॥ কমিউনিজ্‌ম্। তখন আমি দস্তুর মতো কমিউনিস্ট। ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে তখন জেহাদ ঘোষণা করি। বলি: মশাই, আমরা হচ্ছি মেহনতি মানুষ, শ্রমিক। আমাদের শোষণ করে, বঞ্চনা করে আপনারা আপনাদের টাকা করেছেন। আপনাদের দাবির পেছনে না আছে নৈতিক ভিত্তি, না আছে কোনো ন্যায়সংগত যুক্তি।—পাবেন না।

মহানন্দ ॥ পাবেন না ?

পরাক্রম ॥ না, পাবেন না।

মহানন্দ ॥ কিন্তু ভাই, আমার কাছ থেকে সেই যে তুমি এক শ' টাকা নিয়েছিলে—

পরাক্রম ॥ বললাম তো এ সপ্তাহে পাবে না।

মহানন্দ ॥ কিন্তু আমার যে বড়ো ঠেকা। সেইজন্যেই তো তোমায় ডেকেছি। না ভাই, আর যাকে যা বলো, আমাকে এমন করে ফাঁকি দিয়োনা। না হয় পরের সপ্তাহেই দিয়ো ; কিন্তু দিয়ো। আমি বরং পরের সপ্তাহেই তোমার বাড়ি যাবো, কেমন ?

পরাক্রম ॥ যেয়ো না ভাই, যেয়ো না। মাসের শেষ সপ্তাহটা, সে বড় ভয়ংকর।

মহানন্দ ॥ ভয়ংকর কিসের ? তোমার ত সব ইজ্‌ম্‌ শেষ হয়ে গেছে—ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌, সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌। এর পরে আর কোনো ইজ্‌ম আছে নাকি ?

পরাক্রম ॥ হ্যাঁ, আছে—ন্যূডইজ্‌ম্‌।

মহানন্দ ॥ এ্যাঁ ? কী ইজ্‌ম্‌ ?

পরাক্রম ॥ ন্যূডইজ্‌ম্‌—নগ্নতাবাদ।

মহানন্দ ॥ সে কী হে ? একেবারে উলঙ্গতান্ত্রিক ?

পরাক্রম ॥ ভয় নেই। আমার চাকর আগে থেকেই তোমাকে সাবধান করে দেবে : ও ঘরে যাবেন না, কত্তা সন্ন্যেসী হয়েছেন—নাগা সন্ন্যেসী।

মহানন্দ ॥ ওরে বাবা! না, না, আমি তাহলে ও মাসের প্রথম সপ্তাহেই এবার চেষ্টা করে দেখবো। মানে, ধনতান্ত্রিক সপ্তাহে।

পরাক্রম ॥ দেখো, দেখবে, কবিগুরুর 'আকবর বাদশার সাথে হরিপদ কেরাণির' কোনো ভেদ নেই। তারপর তোমার বরাত। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন উঠি।

মহানন্দ ॥ [ঘড়ি দেখিয়া] হ্যাঁ, তোমাকে এখন উঠতেই হবে। আমাদের পার্লামেণ্টের অধিবেশনের সময় হয়ে গেছে। মন্ত্রী আর সদস্যরা সবাই এলেন বলে।

পরাক্রম ॥ মন্ত্রী ? —ও, হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমার সেই গৃহরাজ্য তা প্রাইমমিনিস্টারটি কে ? তুমি, না মিসেস ?

মহানন্দ ॥ প্রাইমমিনিস্টার আমি—মহানন্দ মিত্র। আর গিন্নী

কাত্যায়নী দেবী হলেন হোমমিনিস্টার—তোমরা যাকে বলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অন্যান্য পোর্টফোলিওগুলোরও বেশির ভাগ উনিই নিয়েছেন। তবে ফিনান্সের পোর্টফোলিওটা আমি জোর করে আমার হাতে রেখেছি।

পরাক্রম ॥ আর ছেলেমেয়েরা ?

মহানন্দ ॥ ওরা সব অর্ডিন্যারি মেম্বার—এম, পি।

পরাক্রম ॥ তা ওরাই তো দলে ভারী। ভোটে তোমাকে হারিয়ে দেয় না ? 'নো কন্‌ফিডেন্স' আনে না ?

মহানন্দ ॥ শোনো, শোনো ; একটা এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে হলে মাথায় বুদ্ধি চাই।

পরাক্রম ॥ সে তো নিশ্চয়।

মহানন্দ ॥ গৃহরাজ্য গণতন্ত্রে শাসিত হবে শুনে সকলেই মহাখুশি। আমি তখন করলাম কী, একটা constitution—মানে, তোমরা যাকে সংবিধান বলো—লিখে ফেললাম। এমন সব কঠিন কঠিন কথা দিলাম তাতে, যে অর্ধেক কথার মানেই কেউ বুঝলো না। বুঝবে কী করে বলো। লেখাপড়া করে কেউ ? সিনেমা থিয়েটার পোশাক আশাক আড্ডা নিয়েই আছে সবাই।

পরাক্রম ॥ তারপর কী হোলো ?

মহানন্দ ॥ সংবিধানের সব কথার মানে না বুঝেই সবাই সই দিয়ে দিলো। আর তাতেই আমি টিকে আছি।

পরাক্রম ॥ কিন্তু ভোট তো ওদের সবারই রয়েছে।

মহানন্দ । কিন্তু 'ভেটো' রয়েছে আমার হাতে। ভোটে ওরা অবাঞ্ছিত কিছু পাশ করিয়ে নেবে বুঝলেই আমি 'ভেটো' মেরে সেটা নাকচ করে দিই।

পরাক্রম ॥ বাঃ! এ তো বেশ।

মহানন্দ ॥ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো সোজা কথা নয়। বুদ্ধি চাই।

পরাক্রম ॥ একদিন তোমাদের অধিবেশন দেখতে হবে। দেখতে পাবো তো ? তোমার বুদ্ধির খেল ?

মহানন্দ ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে ভিজিটার্স গ্যালারিতে বসিয়ে দেবো, কিন্তু খবরদার ! আমাদের প্রসিডিংস দেখে তুমি হাসতে পারবে না, উত্তেজিত হতে পারবে না, হাততালি দিতে পারবে না। আর কোনো শ্লোগান তো নয়ই।

পরাক্রম ।। বেশ, তাই হবে। আজ তবে আসি।

মহানন্দ ।। এসো ভাই, এসো। আর শোনো, পরের মাসে প্রথম সপ্তাহেই আমি যাচ্ছি তোমার কাছে। হ্যাঁ, তোমাদের আইন অমান্য আন্দোলন চালু হবার আগে।

[কথা শেষ হইবার পুর্বেই পরাক্রম সান্যাল চলিয়া গেলেন]

মহানন্দ ।। নাঃ ! কথাটা কানেই তুললে না ! একে ওকে ফাঁকি দিয়ে, ধার কর্জ করে বেশ আছে। মুক্ত পুরুষ। আমার মতো রাজ্য-শাসনের ঝামেলা নেই। আইন টাইনের হ্যাঙ্গামাই নেই। [চিৎকার করিয়া] ভূতো ! ভূতো ! ভূতনাথ !

[ভূতনাথ ছুটিয়া আসিল।]

ভূতনাথ ।। আজ্ঞে, আমাকে ডাকছেন স্যার ?

মহানন্দ ।। লোকসভার অধিবেশনের সময় হয়ে গেছে। সব ব্যবস্থা করো। সার্জেন্টের পোশাক পরো। আমি আসছি।

[মহানন্দ অন্দরে গেলেন। ভূতনাথ ব্যস্তভাবে টেবিলের উপর হইতে কাপ প্লেট লইয়া গেল। সংগে সংগে আবার ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের উপর একটি সুন্দর টেবিল ক্লথ পাতিয়া দিল. টেবিলের শিরোদেশে একটি মর্যাদাজ্ঞাপক ভালো চেয়ার আনিয়া রাখিল। তড়িৎগতিতে সাজসজ্জা সারিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। একটু পরেই আবার সে ফিরিয়া আসিল। এখন তাহার অন্য বেশ। সার্জেন্ট। সার্জেন্ট-এট-আর্ম এর কায়দায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।]

ভূতনাথ ।। আনন্দভবন গৃহরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমহানন্দ মিত্র। আনন্দভবন গৃহরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী কাত্যায়নী মিত্র। আনন্দভবন গৃহরাজ্যের লোকসভার সদস্যগণ, শ্রীঅরুণ মিত্র, শ্রীবরুণ মিত্র, শ্রীতরুণ মিত্র এবং শ্রীমতী কেকা মিত্র।

[নামোচ্চারণের সংগে সংগে একে একে সকলে টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। কাহারো কাহারো মুখে উত্তেজনার চিহ্ন।]

মহানন্দ ॥ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের আনন্দ-ভবন গৃহরাজ্যের এই লোকসভার জরুরী অধিবেশনটি শুরু করার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সকলে ॥ সাধু। সাধু।

তরুণ ॥ যা বলবে সংক্ষেপে বলো বাবা!

মহানন্দ ॥ অর্ডার! অর্ডার! লোকসভার অধিবেশনকালে আমি কারো বাবা নই। এই কাত্যায়নী দেবী আমার স্ত্রী নন। আর অরুণ, বরুণ, তরুণ এবং কেকা, তোমরাও আমার পুত্রকন্যা নও।

সকলে ॥ সাধু। সাধু।

মহানন্দ ॥ আমাদের আনন্দভবন গৃহরাজ্যের যে 'কনষ্টিটিউসন'—মানে, সংবিধান—আমরা সর্বসম্মতিক্রমে স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেছি, যা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য আমরা 'ওথ'—মানে, শপথ নিয়েছি, সেই সংবিধানে ঘোষিতহয়েছে আমাদের সরকার, লোকায়ত্ব সরকার। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেই আমাদের গৃহরাজ্য পরিচালিত করার সংকল্প নিয়েছি আমরা। হ্যাঁ, সংবিধানেও এ সংকল্প লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সকলে ॥ সাধু। সাধু। [হাততালি]

মহানন্দ ॥ মাননীয় সদস্যগণ, আজ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে একটি বেসরকারি বিল। বিলটি এনেছেন আমাদের এই লোকসভার কনিষ্ঠতম সদস্য শ্রীতরুণ মিত্র। বিলটি নামকরণ করা হয়েছে "পুত্রকল্যাণ বিল।" এর প্রস্তাবিত বিধানগুলি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল।

তরুণ ॥ না, না, মোটেই না। এইরূপ জঘন্য উক্তির আমি তীব্র প্রতিবাদ করি।

বরুণ ॥ বিলের সব ধারাগুলি যদিও আমি এবং আমার সমাজতন্ত্রীদল অনুমোদন করি না, তবু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একদেশ-দর্শিতার নিন্দা করি।

অরুণ ।। স্বতন্ত্র দলের পক্ষ থেকে আমি বলছি, বিলটির যথাযথ আলোচনা যেন প্রধানমন্ত্রী বন্ধ করার অপচেষ্টা না করেন।

কেকা ।। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর এ ক্ষমতা অবশ্যই আছে যে, বিলটি সংবিধান বিরোধী হলে তিনি এর আলোচনা অবশ্যই বন্ধ করতে পারেন।

সকলে ।। শেম্! শেম্!

মহানন্দ ।। অর্ডার! অর্ডার! শ্রীমতী কেকা মিত্র শান্ত হোন। মাননীয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমি এই বিলটি আমাদের মন্ত্রীসভার এক বিশেষ অধিবেশনে গভীরভাবে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বিলটি সংবিধান বিরোধী নয়। এবং তজ্জন্য আলোচনাযোগ্য।

কতিপয় সদস্য ।। [টেবিল চাপড়াইয়া] সাধু! সাধু!

কেকা ।। টেবিলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কাত্যায়নী ।। শ্রীমতী কেকা মিত্র একটি জ্বলন্ত সত্যের প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিবেচনা করে দেখো, তার নাম কী, এ হোল গিয়ে সভা। সভা সভ্যভাবেই পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

তরুণ ।। অন্ এ পয়েন্ট অব অর্ডার! স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই উক্তির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। তাঁর এই কটূক্তির নির্গলিতার্থ হচ্ছে, আমরা অসভ্য।

কেকা ।। হিয়ার, হিয়ার, শুনুন, শুনুন!

মহানন্দ ।। কাতু, কাতু, তোমার এই উক্তি প্রত্যাহার করো কাতু।

[সদস্যদের তুমুল গর্জন।]

তরুণ ।। হোয়াট ইজ কাতু ?

বরুণ ।। উইথড্র, উইথড্র।

মহানন্দ ।। কাতু মানে মাননীয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কাত্যায়নী দেবী। আমি আমার উক্তি প্রত্যাহার করে মূল বক্তব্য বিষয়ে আসছি। শ্রীতরুণ

১৬

মিত্র এই হাউস—মানে, গৃহের সামনে যে-বিলটি এনেছেন তা সংবিধান বিরোধী না হলেও এবং আলোচনা যোগ্য হলেও কার্যত নৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় গ্রহণ যোগ্য নয়। মাননীয় সদস্যগণ! একথা অতীব সত্য যে, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রচিত এই সংবিধান অনুযায়ী আমাদের এই গৃহরাজ্য পরিচালনায় সর্ববিধ ক্ষমতা এবং দায়িত্ব, মাননীয় সদস্যগণ, আপনাদের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে। এ আশা আমি অবশ্যই করবো যে, আপনারা তার অপব্যবহার করবেন না। সর্বদা মনে রাখবেন, আমাদের এবছরকার বাজেট সারপ্লাস বাজেট নয়, ডেফিসিট বাজেট।

কাত্যায়নী ॥ নিশ্চয়। তারপর বিবেচনা করে দেখো, তার নাম কী, এ হোল গিয়ে আকালের বছর। চালের দামটা ভালো করে বিবেচনা করে দেখো।

তরুণ ॥ চালের দামের সংগে আমার প্রস্তাবিত বিলের কোন সম্পর্ক নেই। এসব অবান্তর কথার তীব্র প্রতিবাদ করি আমি। আমার বিলের বিষয়বস্তু হচ্ছে সমগ্র দেশের নিযাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত পুত্রসমাজের অত্যন্ত ন্যায়সংগত দাবি পূরণের দাবি। দেশের প্রত্যেকটি গৃহরাজ্যকে আজ এই দাবিপূরণ করতেই হবে। নতুবা বিদ্রোহের ঘনঘোরঘটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি

মহানন্দ ॥ উত্তেজিত হয়োনা বৎস, উত্তেজিত হয়ো না।

বরুণ ॥ হোয়াট ইজ বৎস?

কতিপয় সদস্য ॥ প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন।

মহানন্দ ॥ প্রত্যাহার করছি।

[সকলের হাততালি।]

মহানন্দ ॥ শ্রীতরুণ মিত্র তাঁর বিলটি এইবার হাউসের সামনে মুভ করুন—মানে, তুলুন।

তরুণ ॥ যেহেতু সবল পিতৃসমাজ বেকার অথবা বিদ্যার্থী পুত্রদের চরম অসহায়তার সুযোগ লইয়া পুত্রদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতিকে পেষণ এবং পীড়ন করেন, সেই হেতু এই পুত্র-

সমাজ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিটি গৃহরাজ্যের পিতৃসমাজের নিকট এই ন্যূনতম দাবি পেশ করিতেছে :

(ক) ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পুত্রকে তথাকথিত শিক্ষালয়রূপ কারাগারে নিক্ষেপ করা চলিবেনা ;

(খ) বিশ্বের প্রগতির সহিত পরিচিত হইবার জন্য নিয়মিত সিনেমা দেখার বাবস্থাকল্পে আলাদা কিছু অর্থের ব্যবস্থা রাখিতে প্রত্যেক গৃহকর্তা বাধ্য থাকিবেন ;

(গ) পুত্রদের গৃহে প্রত্যাগমনের সময় সম্পর্কে কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা চলিবেনা—কারণ, গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশে পুত্রদের বিশ্বজনীন সংস্কৃতি শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে না।

কাত্যায়নী ।। এই বড়ো বড়ো কথাগুলো কোত্থেকে শিখলি রে তরুণ ?

তরুণ ।। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীব এই জঘন্য উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁব উক্তি প্রত্যাহার না করলে আমি লোকসভা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হবো।

কতিপয় সদস্য ।। প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন।

মহানন্দ ।। কথাটা তুমি প্রত্যাহাব কবো কাতু।

বরুণ ।। এগেন 'কাতু' ?

কাত্যায়নী ।। আমি প্রত্যাহার কবছি। আপনি বলুন।

তরুণ ।। আমার বিলটির সর্বশেষ ধারা (ঘ) পুত্রদেব পোশাক নির্বাচন, কেশ কর্তন এবং সামগ্রিক প্রসাধন সম্পর্কে পুত্রদের রুচিই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।—সমগ্র বিলটি 'পুত্রকল্যাণ বিল'—নামে এই গৃহরাজ্যে গৃহীত হউক—আমি প্রস্তাব করিতেছি।

বরুণ ।। সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে আমি এই বিল সমর্থন করিতেছি।

অরুণ ।। বর্তমান সমাজে বিলটির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। স্বতন্ত্র দলের পক্ষ হইতে আমি আমার সমর্থন জানাইতেছি।

কেকা ।। বিলটি যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, নারীসমাজের পক্ষ হইতে আমি ইহা অনুমোদন করিতে পারি না। তবে হ্যাঁ, প্রস্তাবক যদি কন্যাসমাজকেও এই বিলের আওতায় আনিয়া বিলটি পুত্রকন্যা

কল্যাণবিলরূপে সংশোধন করিয়া লন তাহা হইলে আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতে আমি সক্ষম।

তরুণ॥ মাননীয় সদস্যগণ, দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি ইহাতে অক্ষম। আমরা ইহা অত্যন্ত পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, নারী সমাজ কোনোরূপ কঠোর সাধনা না করিয়াই অপরের নৌকায় উঠিয়া ওপারের বন্দরে গিয়া লাভবান হইতে চায়।

কেকা॥ আমি এই জঘন্য নির্লজ্জ উক্তির তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করি।

তরুণ॥ চিৎকারে সত্যের কণ্ঠরোধ হয় না।

কেকা॥ ভালো হচ্ছেনা খোকা।

তরুণ॥ মুখ সামলে কথা বলবি ছুটকি।

বরুণ॥ হোয়াট ইজ 'খোকা'?

অরুণ॥ হোয়াট ইজ 'ছুটকি'?

কাত্যায়নী॥ এসব হচ্ছে কী? বিবেচনা করো—তার নাম কী—এ হলো গিয়ে সভা। মেছোবাজার নয়।

তরুণ॥ কী বলছো মা? এটা মেছো বাজার?

বরুণ॥ হোয়াট ইজ 'মা'? এখানে মা-টা নেই।

মহানন্দ॥ অর্ডার! অর্ডার।

কেকা॥ তোমরা মাকে অপমান করছো!

তরুণ॥ সরকার পক্ষের দালাল।

অরুণ ও বরুণ॥ শেম! শেম!

তরুণ॥ মাকে জানা আছে। মা তো নয়, ডাইনী।

বরুণ॥ তা নয় তো কী? বাবাকে সব সময় কু-বুদ্ধি দিচ্ছে।

তরুণ॥ আর তাতেই তো ওই বুড়োটা—

অরুণ॥ খোকা, মুখ সামলে কথা বলবি। ওই বুড়োটা আছে বলেই এখনো টিঁকে আছিস।

তরুণ॥ জানি, জানি, ও স্বতন্ত্রদলকেও জানি। যত সব—অপরচুনিস্ট।

বরুণ॥ তা নয় তো কী! যতসব সরকারের দালাল!

অরুণ ॥ কী ? আমাকে দালাল বলছিস ?

কাত্যায়নী ॥ এ কী ? ওরা যে আস্তিন গোটাচ্ছে ! মালকোঁচা মারছে ! বিবেচনা করো—তার নাম কী—এ হোলো গিয়ে—

কেকা ॥ অরাজকতা। কোথায় রইলো মা, তোমার "ল এ্যাণ্ড অর্ডার ?"

কাত্যায়নী ॥ [মহানন্দকে] ওগো, বিবেচনা করো—তার নাম কী—সভার সার্জেণ্ট গেলো কোথায় ?

ভূতনাথ ॥ আমার অর্ধাঙ্গ মর-মর। আমি সরে পড়ছি। [পলায়ন।]

তরুণ ॥ ভেবেছো কী ? তোমরা সব ভেবেছো কী ?

অরুণ ॥ আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

তরুণ ॥ [চিৎকার করিয়া] পুত্রসংঘের ভাইরা, আশে পাশে যদি থেকে থাকো তাহলে শিগ্‌গির চলে এসো।

কাত্যায়নী ॥ [মহানন্দকে] ওগো দেখছো কী ? এযে গৃহযুদ্ধ—তার নাম কি এ হ'ল গিয়ে সিভিল ওয়ার্।

কেকা ॥ তা হলে কী হবে মা ?

কাত্যায়নী ॥ [মহানন্দকে] দাঁড়িয়ে দেখছো কী ? মিলিটারী ডাকো।

মহানন্দ ॥ হ্যাঁ, [চিৎকার করিয়া] মিলিটারী ! মিলিটারী !
কেউ নেই ! গেলো কোথায় সব ? মিলিটারী ?

কেকা ॥ স্ট্রাইক করেছে বাবা।

মহানন্দ ॥ স্ট্রাইক করেছে, মিলিটারী স্ট্রাইক করেছে ? কাতু, দেখছো কী ! এদিকে ঘোরতর সিভিল ওয়ার। আর ওদিকে coup-d'etat ক্যু-দ-তাত হতে চলেছে। পালাও, পালাও শিগ্‌গির।

কাত্যায়নী ॥ কিন্তু ওরা যে যুদ্ধ করছে।

মহানন্দ ॥ ব্যাক্ ডোর দিয়ে পালাও—সোজা খাবার ঘরে।
খাবার ঘণ্টা বাজাও—এখনি সব ঠাণ্ডা হবে।

[তাহাই হইল ॥ যবনিকা।]

॥ নববঙ্গ ॥
পূজাসংখ্যা ॥
বঙ্গাব্দ ১৩৬৭ ॥

গোপালের মা

[শহরতলীর একটি বস্তিতে নন্দলালের ঘর। বেপরোয়া লোক বলিয়া এ অঞ্চলে তাহাকে সকলে সমীহ করে। চুরি অথবা চোরাই মালের কারবার তাহার ব্যবসা। তাহার সংসার বলিতে একমাত্র যশোদা নাম্নী একটি রমণী। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। নন্দলাল তখনো ঘরে ফিরে নাই। যশোদা একটি রূপার নাড়ু গোপালের মূর্তি হাতে লইয়া তাহাকে আদর করিতেছে ও আপন মনে গাহিতেছে।]

যশোদা॥ "গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরানে॥
গোপাল যাবে বাথানে,—কী শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কতো চমকি' চমকি' উঠি,
নয়ন-নিমিখে হই হারা॥"

[দরজায় করাঘাত]

যশোদা॥ কে?

পুরুষকণ্ঠ॥ [বাহির হইতে] খুলে দে।

[যশোদা দরজা খুলিয়া দিল। নন্দলাল তাহার দৈনিক কাজ কর্ম অন্তে ঘরে প্রবেশ করিল এবং কথা বলিতে বলিতে জামা ঝুলি ইত্যাদি খুলিয়া রাখিল]

নন্দলাল॥ বাইরের কোনো বাজে লোক আমার খোঁজে এসেছিলো?

যশোদা॥ না তো!

নন্দ॥ খাবার টাবার কিছু করেছিস? না তোর গোপাল নিয়েই মেতে ছিলি সারাদিন?

যশোদা॥ ছেলে নিয়ে তো ঘর করনি কোনদিন; করলে একথা মুখ দিয়ে বেরোতো না তোমার। বাড়ীর বউ ছেলে নিয়েও মাতে আবার

ঘরের কাজও করে। ওমা, তা না হ'লে চলে নাকি? এসো খেতে বসো।

নন্দ॥ না রে, আজ আর কিছু খাবোনা। বাইরের রেস্তোরাঁতে খুব গিলে এসেছি। তুই খেয়ে নে যশোদা।

যশোদা॥ আমাকে না খাইয়ে ছেড়েছে নাকি আমার এই গোপাল?

নন্দ॥ মানে?

যশোদা॥ আজ দুধ কিনে ক্ষীর, সর, ননী তৈরী করেছিলাম ঘরে। আমার গোপাল সে ভোগ কিছুতেই খাবেনা আমি না খেলে।

নন্দ॥ তুই কী বলছিস যশোদা, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

যশোদা॥ আমি জানি, তুমি একথা বলবে। কিন্তু কি করে তোমাকে বোঝাবো আমার কথা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।

নন্দ॥ শোন যশোদা, আজ তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কাজের কথা আছে। ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো শোন। মল্লিকদের বাড়ীর মন্দির থেকে ওই বিগ্রহটা সরিয়েছি মঙ্গলে মঙ্গলে আট, বুধে নয়, আজ বেস্পতি, পুরো দশ দিন। এই ঠাকুর চুরিতে গোটা পাড়ায় কী সোরগোল পড়েছে জানিস তো? পুলিশ হন্যে হয়ে চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাল বুধবার গেছে, কাল্‌তক আমাকে কেউ সন্দেহ করে নি। গোপালের হার গলিয়ে যা পেয়েছি তা দিয়ে বাজার দেনা শোধ করেছি। এখনো হাতে বেশ কিছু আছে।

যশোদা॥ ওগো যা আছে তা দিয়ে আমার গোপালের জন্য আর একটা হার গড়িয়ে দাওনা।

নন্দ॥ নিকুচি করেছে তোর হারের। বাজার দেনা শোধ করতেই বিপদ এসে গেছে। আজ রেঁস্তোরাতে বসে খাচ্ছি, এমন সময় এ পাড়ার সেই টিকটিকি পুলিশটা আমার পাশে বসে চা খেতে খেতে আমায় শুধোয়,—"কি হে নন্দলাল, আজ কাল দেখছি বেশ কিছু কামাচ্ছো। দেনা টেনা সব শোধ করেছো"—এই বলে কী রকম বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো। চা টা আর আমি শেষ করতে পারলাম না যশোদা। আমতা আমতা করে

কী যে জবাব দিলাম মনেও পড়ছে না ছাই। আমার মনে হচ্ছে যশোদা, লোকটা তক্কে তক্কে আছে। হয়তো আজ রাতেই দল বল নিয়ে আমার ঘর খানাতল্লাসী করবে!

যশোদা ॥ এ্যাঁ! খানাতল্লাসী করবে? আমার গোপাল কেড়ে নেবে?

নন্দ ॥ তা নয়তো কি? তোর ওই গোপালের জন্য এখন দু'জনের হাতেই দড়ি পরবে। তখনই বল্‌লুম ওরে ওটাকে পুকুরে ফেলে দি'—দিলি নাতো? এখন?

যশোদা ॥ কেন দেবো? দশ বচ্ছর তোর সঙ্গে ঘর করছি। কোনো গোপালইতো আমার কোলে আসেনি। কতো তাবিজকবচ, কতো পূজামানত, ঠাকুর দেবতার পায়ে কতো মাথাখোঁড়া, কিছুতে কিছু হ'ল না। আর সে যে হয়নি, আমার কোলে এই গোপাল আসবেন বলেই হয় নি। একে আমি ছেড়ে দেবো? ছেড়ে দিতে পারি?

নন্দ ॥ তো ধরেই রাখো। পুলিশ এসে আমাদের ধরুক।

যশোদা ॥ তার চেয়ে চলো না কেনো আমরা পালাই? এই রাতে। এখনি।

[সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় শয়ান গোপালকে বুকে তুলিয়া লইল]

নন্দ ॥ এ না হলে লোকে বলে স্ত্রী বুদ্ধি? বাইরে গিয়ে দেখে আয় আমরা হয়তো এতক্ষণ নজরবন্দী। পুলিশ হয়তো এ পাড়াটা সদলবলে ঘিরে ফেলেছে। না—না, এখনো হয়তো বাঁচার পথ আছে, মূর্তিটা আমার হাতে দে।

যশোদা ॥ কী করবে শুনি?

নন্দ ॥ ওটাকে আমি ভাঙ্গবো।

যশোদা ॥ [সার্তনাদে] এ্যাঁ?

নন্দ ॥ এখনো যা সময় আছে, পারবো আমি এটাকে চুরমার করে ফেলতে।

যশোদা ॥ না—না, ওগো না।

[সভয়ে পিছাইয়া গেল]

নন্দ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ চুরমার করে ফেলতে পারলেই চুরির কোনো প্রমাণ থাকবে না। আমরা বেঁচে যাবো। তুই দে, ওটা আমার হাতে দে।

[যশোদার দিকে রুদ্র মূর্তিতে অগ্রসর হইল]

যশোদা ॥ না না, আমার গোপাল ঘুমুচ্ছে। তুমি ও সব কথা বলো না। ও জেগে উঠবে।

নন্দ ॥ কী বিপদ! নিজের বিপদ বুঝছিস না? ওই পুতুলটাই আজ তোর বড়ো হল?

যশোদা ॥ পুতুল কাকে বলছো তুমি? আমার গোপালকে পুতুল বলছো?

[নন্দলাল বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল]

নন্দ ॥ বাইরে তাদের গলা পাচ্ছি। পায়ের আওয়াজ শুনছি। তোর উনুন এখনো জ্বলছে দেখছি, ওটাকে ওই উনুনে—

[রুদ্রমূর্তিতে যশোদার নিকট হইতে বিগ্রহটি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা। যশোদা চীৎকার করিয়া উঠিল।]

যশোদা ॥ কে কোথায় আছো? খুন! খুন! আমার গোপালকে খুন করছে! বাঁচাও, কে কোথায় আছো—শিগ্‌গীর এসো, আমার গোপালকে বাঁচাও।

[দরজা ভাঙিয়া পুলিশসহ একজন অফিসারের প্রবেশ। নন্দলাল শান্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যশোদা তাহার গোপালকে লইয়া অফিসারের সামনে ছুটিয়া আসিল।]

যশোদা ॥ এই নাও আমার গোপাল। ওকে বাঁচাও! ওকে বাঁচাও।

॥ যবনিকা ॥

উজ্জ্বল ভারত ॥ শারদীয়া সংখ্যা ॥ বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ ॥

স মা প্ত

মন্মথ রায়

জীবন ও সাধনা

জন্ম ও নিবাস—জন্ম বঙ্গাব্দ ১৩০৬ পহেলা আষাঢ় (ইং ১৮৯৯), জন্মস্থান : পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার 'গালা' গ্রাম। সাত বৎসর বয়স হইতে পিতা পিতামহসহ উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট সহরে স্থায়ীভাবে বাস।

শিক্ষা—বালুরঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠকালে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘরে' অমলের ভূমিকায় অবতরণে নাট্যজীবনের সূত্রপাত। ১৯২১ সালে কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দিতে গিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ঐ বৎসরই 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' হইতে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, এবং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ এবং বি-এল পাশ করেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এথ্‌লেটিক ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন।

আত্মজীবন—১৯২৬ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত বালুরঘাটে ওকালতি করেন। এই সময় বালুরঘাট লোকালবোর্ড, বালুরঘাট ইউনিয়নবোর্ড, দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এবং দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্টস্কুলবোর্ডের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। এসোসিয়েটেড প্রেস, ফ্রি প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেসের বালুরঘাটস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা ছিলেন। কিছুকাল বৃহৎ একটি জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজারও ছিলেন।

নাটক—তাঁহার রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক, 'মুক্তির ডাক' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পাঠ কালে রচিত হইয়া ষ্টার থিয়েটার কর্তৃক ১৯২৩ সালে অভিনীত হয়। ১৯২৩ হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে 'সেমিরেমিস', 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'মহুয়া', 'কারাগার', 'সাবিত্রী', 'অশোক', 'খনা', বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজনটী', 'রূপকথা', 'মীরকাশিম', প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখিয়া বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে একটি নূতন প্রতিভারূপে স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার দেশাত্মবোধক 'কারাগার' নাটকের অভিনয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রাজদ্রোহমূলক বলিয়া নিষিদ্ধ হয়।

সিনেমা—ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রে তাঁহার রচিত 'চাঁদসদাগর', 'মহুয়া', 'অভিনয়', 'খনা', 'সাবিত্রী,' 'কুমকুম', 'মীনাক্ষী', 'রাজনর্ত্তকী', 'যোগাযোগ', 'হসপিটাল' প্রমুখ বহু কাহিনী, সবাক চিত্রে রূপায়িত হইয়া জনপ্রিয় হয়। মন্মথ রায়ের 'Court Dancer' ভারতে নির্মিত প্রথম সবাক ইংরাজী চলচ্চিত্র—মেট্রোতে প্রদর্শিত প্রথম ভারতীয় ছবি। ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিতপাষাণ' ফিল্মের নাট্যরূপও তাঁহার।

রেকর্ড নাট্য—তাঁহার রচিত 'খনা', 'রামপ্রসাদ', 'শকুন্তলা', 'নরমেধ', 'লায়লিমজনু', 'কাফনচোরা', 'স্বরথউদ্ধার, 'সাবিত্রী, 'মদনমোহন', 'কারাগার', 'মীরকাশিম', 'চাঁদসদাগর', 'বামাখ্যাপা', 'ক্ষুদিরাম', 'শ্রীশ্রীসারদামণি', প্রভৃতি রেকর্ড নাটকগুলি বিশেষ জনপ্রিয়।

রেডিয়ো—তাঁহার রচিত বহু এবং বহুবিধ নাটক বেতারে অভিনীত হইয়াও সুখ্যাত হইয়াছে এবং 'ফকিরের পাথর', 'গঙ্গাবতরণ', 'বীরভূম', আকাশবাণীর সমুদয় ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। তিনি ১৯৫৮ হইতে ১৯৬১ পর্যন্ত আকাশবাণীর প্রযোজক পদেও অধিষ্টিত ছিলেন।

পত্রিকা সম্পাদনা—১৯৩৮ সালে তিনি বালুরঘাট ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়া ক্রমান্বয়ে 'ভাণ্ডার', 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জার্ণাল', এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'বসুন্ধরা', পত্রিকাব সম্পাদনা করেন।

চিত্র পরিচালনা—১৯৪৭ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'প্রচারপ্রযোজক' পদে নিযুক্ত থাকিয়া বহু ডকুমেণ্টারী তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন। তাঁহার পরিচালিত 'সাঁওতালজীবন', 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম' প্রভৃতি তথ্যচিত্র আজ সুপ্রসিদ্ধ।

বিবিধ—১৯৫২ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। জাতিগঠনমূলক নাটকাভিনয় উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গসরকারের প্রচারবিভাগে নিজ পরিকল্পিত 'লোকরঞ্জন শাখা' গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী কার্যে বাংলাভাষা প্রবর্তনের জন্য ১৯৪৭ সালে ৺রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে গঠিত পরিভাষাসংসদের যুক্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬১ সালে পুনর্গঠিত পরিভাষাসংসদেরও সদস্য।

আধুনিক নাট্যকর্ম—১৯৫৩ সাল হইতে রঙ্গমঞ্চের জন্যে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক

নাটক লেখা সুরু করেন। ভারতের মুক্তিআন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত তাঁহার সামাজিক নাটক 'মহাভারতী' ১৯৫৪ সালে কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে এবং পরে হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়া ১৯৫৭ সালে, দিল্লীতে সিপাহীবিদ্রোহ-শতবার্ষিকী উৎসবে অভিনীত হইয়া দেশ-বিখ্যাত হইয়াছে। আধুনিককালে তাঁহার 'জীবনটাই নাটক', 'জটাগঙ্গার বাঁধ', 'গুপ্তধন', 'জীবনমরণ', 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'রঘুডাকাত', 'ধর্মঘট', 'পথেবিপথে', 'চাষীর প্রেম', 'আজবদেশ', 'উর্বশী নিরুদ্দেশ', 'মীরাবাই' 'শ্রীশ্রীমা' 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'বন্দিতা', 'অমৃতঅতীত' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং 'একাঙ্কিকা' 'ছোটদের একাঙ্কিকা', 'নব একাঙ্ক', 'মরাহাতী লাখটাকা', কোটিপতি নিরুদ্দেশ', 'ফকিরের পাথর' প্রমুখ একাঙ্ক নাট্যগ্রন্থাবলী স্মরণীয় অবদান। ঢাকুরিয়া লেকে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি অভিনীত প্রখ্যাত জলনাটক 'কালীয়দমন'ও তাঁহারই রচনা। 'গঙ্গাবতরণ' নামক তাঁহার নৃত্যনাটকও নয়াদিল্লীতে সুখ্যাত।

একাঙ্কিকা—এ দেশে একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক রূপে তাঁহার খ্যাতি ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে 'মুক্তিরডাক' প্রমুখ তাঁহার একাঙ্ক নাটক রচনা সুরু হইয়াছে। 'কল্লোল' 'ভারতবর্ষ' 'সবুজপত্র' প্রমুখ বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় তাঁহার একাঙ্ক নাটক আজ প্রায় চল্লিশ বর্ষকাল প্রকাশিত হইতেছে। একাঙ্ক নাটকের 'একাঙ্কিকা' নামকরণও তাঁহারই। নটস্থর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর একটি গবেষণায় প্রকাশঃ "যখন হর্ণিম্যান ও গ্লাসগোর রিপারেটরী থিয়েটারের হাতে পাশ্চাত্ত্য একাঙ্কিকা সাহিত্যের নব নব রূপ পরিগ্রহ করে চলেছিল, ঠিক সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ হয়। ১৯২৩ সালে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' এই পথের প্রধান পথিকৃত।"

১৯৬১—মন্মথ রায় ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি বঙ্গীয় 'নাট্যকার সঙ্ঘের' সভাপতি ও বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনাপরিষদের সহ-সভাপতি।

আলোচনা

সে যুগে ও এ যুগে

"আপনি শুনে খুসি হবেন যে "মুক্তির ডাক" আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার নাটক খানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি drama। বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্লেই হয়। আশাকরি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন।"

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[বঙ্গসাহিত্যের '**বীরবল**'। **সবুজ-পত্র** সম্পাদক]

১৩-৭-১৯২৪

"মুক্তির ডাক" পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহা সত্য সত্যই মুক্তির ডাক।"

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি এইচ ডি,

২৮-৬-১৯২৪

"মুক্তির ডাক" বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্যে একটা নতুন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে।"

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি এল

২৬-৬-১৯২৪

"একবুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক-দীঘি পদ্ম দেখলে দুচোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পু'রে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কী মনে করবেন জানিনে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভাল ক'রে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।……'সেমিরেমিস' পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছি নে।… 'সেমিরেমিসে' আমি যেন তলিয়ে গেছি। এতবড় সৃষ্টি! আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।"

নজরুল ইসলাম

৪-৭-১৯২৭

"পৌরাণিক নাটক লিখিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাম করিতে হয়। শুধু পৌরাণিক নাটক নহে, সর্বপ্রকার নাটক আলোচনা কালে ইঁহাকে আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা চলে। নাটকের মধ্যে ইনি এক অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং এক অনাস্বাদিত

রস বিকাশ করিয়া দেখাইলেন। নাটকে এরূপ সুতীব্র ভাবাবেগ এবং সুপ্রখর ক্রিয়াময়তা সৃষ্টি করিতে খুব কম নাট্যকারই পারিয়াছেন। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি পর্দা ইনি সুনিপুণ হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

অধ্যাপক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ কৃত
"বাংলা নাটকের ইতিহাস"

"তাঁহার নাটকের ঘটনাসমূহ সাধারণতঃ রোমাঞ্চকর—দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইতে হয়। অতি আধুনিক যুগে বাহ্য নাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে—তাঁহার নাটক তাহা হইতেও বঞ্চিত নহে। রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ তাঁহার নাটকের একটি প্রধান গুণ।... এই দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে একমাত্র তাঁহার মধ্য দিয়াই এই যুগে, আধুনিক যুগের সঙ্গে অতিআধুনিক যুগের সংযোগ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।"

অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য কৃত
"বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস"

"বাংলায় 'One-act play' জাতীয় রচনা ছিল না বললেই চলে। এইক্ষেত্রে মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব অসীম। তিনি এ বিষয়ে পথিকৃৎ ও বটে, আবার অদ্যাবধি অজেয়ও বটে। বর্তমান প্রচলিত একাঙ্কিকা নামটিও তাঁরই দেওয়া।"

নারায়ণ চৌধুরী
শনিবারের চিঠি ॥ অগ্রহায়ণ : ১৩৬২ ॥

"...নতুন আঙ্গিকের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ ক'রে তাঁর একান্ত নিজস্ব বিস্ময়কর একাঙ্কিকাবলীর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করলে একক মন্মথ রায়কেই একটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে। ...বর্তমান যুগচিন্তা সাহিত্যের কাছে যে দাবী করে চলেছে, মন্মথরায় নাট্যকার রূপে সেই অব্যক্ত বিক্ষোভ এবং মানব মনের সত্যানুভূতিকে সার্থক বাণীরূপ দান করে এক মহান কর্তব্য সাধিত করে চলেছেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা
৫-৫-১৯৫৭

'ধর্মঘট—পথেবিপথে—চাষীর প্রেম—আজবদেশ' সম্পর্কে ঃ

"মহীয়ান শিল্পীর নবজন্ম।...কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ এসব নাটকে কোথাও নেই, আছে চেতনার স্বতস্ফুর্ত জাগরণ। তাই অশ্রু এখানে গ্লিসারিন দেওয়া নয়, বুক ফাটা কান্নারই প্রকাশ; বিকার এখানে চীৎকারে পর্যবসিত না হয়ে, পেয়েছে শাণিত ব্যঙ্গের রূপ; হাসি সুড়সুড়ি দিয়ে নয়, আনন্দের প্রাণ খোলা অভিব্যক্তি।...শুধু মেঠো লোকেরাই এ নাটক চারটির রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন না, ইংরেজী নাটক পড়ুয়ারাও পড়ে বিস্মিত হবেন। রচনাশৈলী সম্পর্কে মুন্সীয়ানা আনতে হলে প্রত্যেকটি তরুণ নাট্যকারের এ নাটক চারটি পড়া দরকার; আর অভিনয়—এক সঙ্গে এমন চারটি নাটক অভিনয় করা যে কোনো নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে গৌরবের।

স্বাধীনতা
২৪-৩-১৯৫৭

"এ ভাবে নব নাট্য আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে আর কেউ পেরেছেন বলে জানা নেই। বিশেষ ক'রে আপনার 'আজবদেশ' তথাকথিত নব্যলেখকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রগতিশীল নাটক কাকে বলে। 'আলো চাই—আরো আলো'র কোনো তুলনা নেই। অন্ততঃ এ দেশের নাট্য সাহিত্যে নেই। ..ঐতিহাসিক নাটকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আপনার 'অশোক'। সাধারণতঃ যে সব ইতিহাসানুগ নাটক চোখে পড়ে তাতে মনে হয় কতকগুলি নির্জীব চরিত্র যেন কোনো মতে ঘটনাপঞ্জী আউড়ে একটা ঐতিহাসিক জীবনীকে কোনো মতে দাঁড় করাচ্ছে। আপনার নাটকেই দেখলাম—প্রকৃত নাটক ইতিহাসের একটা যুগকে ধরার চেষ্টা করে, তৎকালীন আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি, রীতি নীতি প্রভৃতিকে প্রতিফলিত করে। ...আপনার 'টোটোপাড়া'—কি অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর।

উৎপল দত্ত
২২-১-১৯৫৭